The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 43-70, ISSN 2306-3920

বিষাদ-সিন্ধু এবং *বিষাদবিন্দু* : ইতিহাসের বৈচিত্র্য

মো. খোরশেদ আলম*

[**সার-সংক্ষেপ :** মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭–১৯১১) উনিশ শতকের *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৯১) এবং শামিম আহমেদের হাল আমলের *বিষাদবিন্দু* (২০১৩) উভয় উপন্যাসে কমবেশি ইতিহাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। দুটো উপন্যাসেই রয়েছে ইতিহাস-ব্যবহারের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য। উপন্যাসদ্বয়ের কেন্দ্রিভূত সত্য– শিল্পিত আখ্যান নির্মাণ। বস্তুত এজিদই উভয় উপন্যাসের প্রার্থিত নায়ক। অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনায় সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত। কারবালার বিষাদাক্রান্ত ঘটনা উভয় উপন্যাসেই স্বীকৃত। কিন্তু ইতিহাসের নানা উপকরণ ব্যবহারে ভিন্নতা লক্ষণীয়। এ-গবেষণাপত্রে শিল্প ও ইতিহাস সংশ্লিষ্টতার আলোকে উপন্যাসদ্বয়ের বৈচিত্র্য অন্বেষণ করার প্রয়াস রয়েছে।]

বিষাদ-সিন্ধু ও *বিষাদবিন্দু* উভয় উপন্যাসের ভিত্তিভূমি কারবালার বিষাদাত্মক কাহিনি। এখানে রয়েছে ঐতিহাসিকতার প্রতি মানবীয় বোধ। ইতিহাস মানবজীবনে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবিত হয়। এ-কারণে উপন্যাসেও ইতিহাসের পুনর্জাগরণ ঘটে থাকে। এই পুনসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঐতিহ্য-ইতিহাস-মিথের সমন্বয় ঘটে। অতীত নতুন টেক্সট হয়ে বর্তমান মানুষের সন্নিকটে এসে দাঁড়ায়। নতুনতর ব্যঞ্জনাধর্মে তা উদ্দীপ্ত করে উপন্যাস-পাঠককে। কথাশিল্পকে লেখক ভিন্ন অনুভবে শৈল্পিক তুলির টানে অভিনব করে তোলেন। কল্পনার উদ্ভাবন-প্রক্রিয়ায় কাহিনি পাঠক মহলে বিচিত্র সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। ঔপন্যাসিক তাঁর সমকাল, জীবন, বোধ, শিল্পের বিচিত্র স্থানে ফর্মকে ভাঙেন, কখনো সমকালীন করে তোলেন। এভাবে উপন্যাস হয়ে ওঠে আধুনিক জীবনের আখ্যান। তাতে ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে সৃষ্টি হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। ঐতিহাসিক উপন্যাস সুদূর অতীতকে বর্তমান করে তুলতে পারে। ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহারের শিল্প-কারিগরিও সেখানে সফলতার মুখ দর্শন করে।

ইতিহাস ও সাহিত্য দুটি ভিন্নতর বিদ্যাশাস্ত্র। 'ঐতিহাসিকের মনে অতীতের পুনর্গঠন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভরশীল।' (কার ২০০৬ : ১৪)। ইতিহাসকে একজন ঔপন্যাসিক কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করবেন তা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচির বিষয়। একজন ঐতিহাসিকের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও অখণ্ড সত্য প্রকাশ সম্ভব নয়। অন্যদিকে একজন ঔপন্যাসিক ইতিহাসের খণ্ডিত সত্যকে শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে পূরণ করতে চান। তাই ইতিহাসের প্রকৃত সত্য, তৎসংলগ্ন মানুষের চিত্র-

---

* **ড. মো. খোরশেদ আলম :** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অঙ্কনে কুশলী সাহিত্যিক মাত্রই পারঙ্গম। জীবনের অন্তর্গত সত্যই তাঁর পক্ষে খণ্ড ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণ। সেদিক থেকে সাহিত্য ও ইতিহাস পরস্পরের হাত ধরে চলে। প্রকাশধর্ম আলাদা হলেও ইতিহাসকার ও সাহিত্যিকের পরস্পর মিলন ঘটে। এ-প্রসঙ্গে অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায় :

> ঐতিহাসিকের বোঝার সময় এসেছে তিনি চিরন্তন বা অখণ্ড সত্যের কারবারী নন। সামগ্রিক দৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরে সম্ভব, হয়ত মরমীয়া সাধকের পক্ষেও। ঐতিহাসিকের নেই কবির মতো কল্পনার স্বাধীনতা, দার্শনিকের মতো বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণের অধিকার, শিল্পীর মতো অরূপকে মূর্ত বা বিমূর্ত রূপ দেবার আকুতি, বৈজ্ঞানিকের মতো প্রাকৃতিক বিধান আবিষ্কার ও প্রয়োগের অভীক্ষা। তবে ইতিহাসের সঙ্গে সবারই লেনদেন আছে। (ত্রিপাঠী ১৯৮৮ : ভূমিকা অংশ)

একজন ইতিহাসকার সন-তারিখ ও ঘটনার পরম্পরা-বিচারে সত্য ঘটনা উপস্থাপন করেন। একজন ঔপন্যাসিকও ইতিহাসকে তাঁর সাহিত্যের পাতায় ধারণ করতে চান। অশীন দাশগুপ্তের ভাষায়– 'যদি কোন বিরল সাহিত্যিক অন্যযুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন, পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন কিন্তু স্বাভাবিক বলে মানেন তা হলে সেই সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী। কিন্তু এই ধর্ম কঠিন এবং এটুকুই শুধু সাহিত্যে ইতিহাসের ধর্ম নয়।' (১৯৮৯ : ৩৫)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাহিত্যের সত্য এবং ইতিহাসের সত্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এই ভিন্নতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধে। তিনি সাহিত্য রস আস্বাদনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ক্ষুদ্র ব্যক্তিবিশেষের সুখ-দুঃখ এবং জীবনের উত্থান-পতনে।

> ব্যক্তি বিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতে বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে; এই রসাবেশ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। (২০০০ : ৪৭৫)

তাই ঔপন্যাসিক শুধু ঘটনার নিরপেক্ষ ইতিবৃত্তকার নন। অতীত-গৌরব প্রমাণে ঘটনা ও চরিত্রের অস্বাভাবিক বিকৃতির অধিকারও হয়ত তাঁর নেই। ইতিহাসের গতিধারা উদ্‌ঘাটন করে তার চালিকাশক্তিগুলোকে তিনি স্পষ্ট করেন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক কিছুটা কল্পনা-আশ্রয়ী হয়ে বিশেষ যুগের জীবনাবেগ, দৃশ্য ও ঘটনাকে জীবন্ত করে তোলেন। অর্থাৎ 'সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস কথা কয়ে উঠবে ও ভবিষ্যৎ পথের দিকে তর্জনি প্রসারিত করে দেবে।' (সরকার ২০০৮ : ৪৭-৪৮)। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন :

> আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত, একথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে... সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। (ঠাকুর ২০০০ : ১১২৪)

অতীতের কাহিনিপ্রবাহে কতকগুলি মুহূর্ত আছে যেখানে সংঘাত, সংকট, আবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট। ঔপন্যাসিক এই মুহূর্তগুলির প্রত্যক্ষ রূপ দিতে চান। ইতিহাসের মর্ম-উদ্ঘাটন করার জন্যই ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণে বেশ খানিকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। তথ্যের প্রতি অতি আনুগত্য শিল্প ও তথ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে ব্যর্থ হয়। অতীত মানবের দুঃখ-যন্ত্রণা, আনন্দ-ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা-আবেগ রচনাকর্মে বাস্তবপ্রীতিই যথেষ্ট নয়। প্রতিভার অনন্য দ্যুতির সাহায্যে ঔপন্যাসিক অতীত মানবজীবনের রঙ্গমঞ্চকে বর্তমান কালে স্থাপিত করবেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট কালের সত্যকে আবিষ্কার করেন। সেই কালটির পরিবেশ, কালের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সংস্কার ও মুক্তির জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিক কল্পনা বলে পরিস্ফুট করবেন। (দত্ত ১৩৯৩ : ৪)।

ক. বিষাদ-সিন্ধুর ঐতিহাসিকতা

উপরিউক্ত প্রসঙ্গসমূহ ধরে *বিষাদ-সিন্ধু*কে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাবে। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের পাত্রপাত্রীদের উপস্থাপন করা হয়। এ-উপন্যাসে ব্যবহৃত চরিত্রগুলোর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এদের বর্ণিত জীবন সম্পর্কে বা ঘটনাবলি সম্পর্কে পুরোপুরি সত্যতার নিশ্চয়তা বিধান করা যায় না। পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশেল থাকতে পারে। এ-প্রসঙ্গে G.M. Travelyan-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> Historical fiction is not a history, but it is springs from history and reacts upon it. Historical novels, even the greatest of them cannot do the specific work of history; they are not dealing except occationally with the real fact of the past. They attempt instead to create in all the profusion and wealth of nature, typical cases imiated from, but not identical with recorded facts. In one sense this is to make the past live; but is not to make the facts live and therefore it is not history. Historical fiction has done much to make history popular and give it value, for it has stimulated the historical imagination. (Travelyan 1921 : 18)

*বিষাদ-সিন্ধু*তে ইমাম হোসেন(রা.) হত্যাকাণ্ডের দায়ি ঘটনাসমূহ উল্লিখিত। এ-উপন্যাসটির কাহিনি পরিকল্পনা তথা প্লটের কেন্দ্রিভূত বিষয় কারবালা ট্রাজেডির

বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন। এতে ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম যথাসম্ভব অবিকৃত। ছোট দু চারটি চরিত্রের নামের বদল কখনো কখনো ঘটেছে। তবু 'যেহেতু ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করেই এটি রচিত হয়েছে, সুতরাং এটাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়।' (আউয়াল ১৯৭৫ : ৬৮)।

কারবালা কাহিনির ইতিহাস-বিচারে এজিদ একটি জটিল ও রহস্যময় চরিত্র। ইতিহাসকারদের হাতে এজিদ কখনো ক্ষমতাবান, কখনো ক্ষমতালোভী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী। একইসঙ্গে এজিদ ক্রমপ্রসারমান ইসলামী সাম্রাজ্যের একজন অংশীদার। সে-ক্ষেত্রে এজিদ হয়ে উঠেছে মহানায়ক, কূটকৌশলী রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের প্রতিভূ। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে যে-এজিদকে তুলে ধরেন তা অনেক ঐতিহাসিকদের মতের সঙ্গে মেলে না। পুঁথিসাহিত্য থেকে মীর মশাররফ হোসেন নানা উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।[১] সেখানকার কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশকে ধর্মভক্ত পাঠকের উপকরণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। হানিফা-এজিদের লড়াই, সখিনা-কাসেমের বিবাহ, জয়নাবের রূপ-খ্যাতি, জায়েদার ভয়ানক ঈর্ষা এবং অলৌকিক ঘটনাসমূহ—পুঁথি থেকেই সঙ্কলিত হয়েছে। কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাকে

১. বাংলা সাহিত্যে কারবালা বিষয় নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেন শেখ ফয়জুল্লা এবং মোহাম্মদ খান। ডক্টর এনামুল হক ও সুকুমার সেনের মতে ষোড়শ শতকে 'জয়নালের চৌতিশা' রচনা করেন শেখ ফয়জুল্লাহ। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রচিত কারবালার কাব্যগ্রন্থ সমূহের সাধারণ নাম ছিল 'জঙ্গনামা'। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ৭৩,১২৭, ১৩৯, ১৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য। এছাড়া ডক্টর সুকুমার সেন, 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য', ৪৫-৪৯ পৃ. দ্রষ্টব্য। এখানে কয়েকজন প্রধান কবির রচনার নাম উল্লেখ করা হল :
'জয়নালের চৌতিশা', শেখ ফয়জুল্লা
'মাকতুল হোসেন', মোহাম্মদ খান
'জঙ্গনামা', নসরুল্লা খান
'আমীর জঙ্গনামা', মনসুর
'জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব', হায়াৎ মামুদ
'জঙ্গনামা', ফকির গরীবুল্লাহ
'জঙ্গনামা', সৈয়দ হামজা
'শহীদে কারবালা', সাদ আলী
'শহীদে কারবালা', আবদুল ওহাব
'ইমামের জঙ্গনামা', রাধারমণ গোপ (অমুসলিম লেখক)
'হানিফা ও কয়রা পরী', শাবিরিদ খান
'কারবালা', আবদুল হাকিম

আরো বেশি করুণাত্মক করে তোলার জন্য তিনি সে-সব ব্যবহার করতে পারেন। মুনীর চৌধুরী তাঁর *মীর মানস* গ্রন্থে *বিষাদ-সিন্ধু* সম্পর্কে বলেন :

> গ্রন্থের উৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন ভূমিকায় বলেন যে, "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত।" এ কথা অবিশ্বাস্য। মুহম্মদ খান, হেয়াত মামুদ, গরীবুল্লাহ, সা'দ আলী, আবদুল ওয়াহাব সকলেই আরবী-ফারসী কিতাবের দোহাই দিয়েছেন। ...পাঠকের চিত্তে ভক্তিশ্রদ্ধাভাব জাগরিত করবার জন্য মীরের পূর্বসূরীরা গ্রন্থারম্ভে যে পর্যায়ের ভণিতা রচনার প্রথা চালু করেন, মশাররফ হোসেন তার অনুকরণ করেছেন মাত্র! পুঁথি রচয়িতাদের আরবী-ফারসী জ্ঞান পরিমাপ করার সুযোগ আমাদের নেই, কিন্তু মীর মানস যে প্রধানতঃ বাংলা পুঁথির দুনিয়াতেই লালিত ও বর্ধিত হয়েছে, তার অনেক প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। স্বভাবতই পুঁথির বিশ্বস্ত সূত্রতায় প্রাপ্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনেক ঘটনাই অলীক। (চৌধুরী ১৯৬৫ : ৪৬-৪৭)

মানবিক সত্তার অঙ্কন ধর্মীয় বাতাবরণকে অনেকখানি আড়াল করে। মুনীর চৌধুরীর ভাষায়, 'গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং প্রদীপ্ত চরিত্র এজিদের। তার চিন্তায়-আচরণে, আবেগে-অভিব্যক্তিতে এমন একটা দৃঢ় গাঢ় ঔজ্জ্বল্য আছে যে অন্যান্য চরিত্র তার পাশে নিতান্ত মর্যাদাহীন বলে মনে হয়।' (চৌধুরী ১৯৯১ : ১৮)। বস্তুত ধর্মীয় ভাব এ-উপন্যাসে অনেকটা অবলুপ্ত। শিল্পীর অদৃশ্য তুলির আঁচড়ে মানব মহিমার কীর্তনে তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। 'এজিদ বধ' পর্বে এসেও সেই মানব মহিমা প্রচার করেন লেখক। শিল্পের বরপুত্র এজিদকে অলক্ষ্যে হানিফার ক্রোধের বলি এবং অবশ্যম্ভাবী লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান তিনি। ফলে 'এজিদ কাহারো বধ্য নহে' এটি ঐতিহাসিক সত্য হলেও শিল্পীর সহানুভূতি সেখানে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষেই জীবন-চেতনায় আধুনিক মানুষের ইন্দ্রিয়-মুখর আখ্যান হয়ে ওঠে *বিষাদ-সিন্ধু*।

ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণ ঘটাতে গিয়ে বিষাদ-সিন্ধুর কিছু স্থানে কালগত অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন এজিদ ও হাসান-হোসেনের বয়স, এজিদের মায়ের বয়সে অসঙ্গতি। একাধিক উপকাহিনির সমাবেশ ও বিস্তৃতি, আকস্মিক ঘটনা কাহিনি-সংগঠনে ত্রুটি ঘটায়। অতিকথন ও আবেগাতিশয্য অনেক সময় গল্পরস জমতে বাধা প্রদান করেছে। চরিত্রের অজস্রতাও রসাহরণে বাধা সৃষ্টি করে। হানিফার আবির্ভাব ও জয়নাল উদ্ধারের কাহিনিতে ঘাত-প্রতিঘাত যতটা গুরুত্ব পেয়েছে সে-তুলনায় চরিত্রের বিকাশ প্রধান হয়ে ওঠেনি। মহাকাব্যিক কাহিনি বিস্তারে ঘটনা ও অতিকল্পনার বিস্তার দোষের কিছু নয়। চরিত্রের মানবিক আবেদন নিঃসন্দেহে এটিকে যুগপৎ আধুনিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস করে তোলে। উপন্যাসে জীবনদর্শনের গভীরতাও একটি পর্যবেক্ষণের বিষয়। মানুষের অন্তরাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ক্যানভাসে জীবনাঙ্কন বড় শিল্পকুশলতার ব্যাপার। যুদ্ধ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব বোধ এ-

উপন্যাসে যে-রাজনৈতিক বোধ তৈরি করে দেয় তা অতুলনীয়। অন্যদিকে *বিষাদ-সিন্ধু* ধর্মীয় পরিকল্পনা ও নীতিবোধ থেকে লিখিত হওয়ায় এর পরিণাম পূর্ব-ঘোষিত। নিয়তির অমোঘ বিধানই এখানে শেষপর্যন্ত কার্যকর। নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান মেনে বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে চরিত্র কখনো কখনো সংগ্রাম বিমুখ। ঈশ্বরের আজ্ঞার দিকে চেয়ে থাকে প্রায় সবাই। দামেস্ক কারাবাসী হোসেন পরিবার হানিফা কর্তৃক মুক্তির আশায় নিরুদ্বিগ্ন কাল কাটায়। এজিদ ও হানিফা এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা পরিণতি জেনেও সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

প্রকৃত অর্থে শিল্প তৈরির অনন্য এক কারিগরিতেই নিমগ্ন ছিলেন মীর মশাররফ। উমাইয়া শাসনকালের ইতিহাসের অনেক উপকরণের সঙ্গেই এর অমিল লক্ষণীয়। অন্যদিকে লেখককে সমকালের অসহ্য উত্তাপও সহ্য করতে হয়েছে। মশাররফের হাতে কারবালার কাহিনিতে ধর্মাদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে কবি কায়কোবাদের(১৮৫৭-১৯৫১) আক্ষেপ এবং এই গ্রন্থের বিপরীতে ধর্মীয় অনুতপ্ততার সঙ্গে *মহররম শরীফ*(১৯৩৩) মহাকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেন, "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ়বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু'র মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।" (১৯৯১ : ২৩)

আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, "এদেশের মুসলিম গণ-মানসে কারবালা কাহিনীর মর্মন্তুদ স্মৃতি দোভাষী পুঁথির মাধ্যমে যে-ধর্মীয় আবেগ নির্মাণ করেছিলো, 'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তা প্রধানত সেই সংবেদনশীলতার কাছেই ঋণী।" (১৯৯১ : ৩৪)। লেখক তাঁর প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে উল্লেখ করেন যে, পারস্য ও আরব গ্রন্থ থেকে তিনি মূল ঘটনার সার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু *বিষাদ-সিন্ধু*র মূল স্পিরিটের সঙ্গে ঐতিহাসিকতার যোগ ক্ষীণ হয়ে ওঠে। কেবল কাঠামোটাকেই তিনি যা ব্যবহার করেন। এর চরিত্র নির্মাণ, অন্তরাবেগের দ্যুতি, কল্পনামণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে। বিশেষত এজিদ চরিত্র নির্মাণে কল্পনার বাধ ভেঙে পড়েছে। যার মধ্যে আবেগদীপ্ত এজিদ রয়েছে কিন্তু পুরোপুরি ঐতিহাসিক এজিদ নয়। মহররমের করুণ কাহিনি অবলম্বনে আরবি, বিশেষ করে ফারসি ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু সেসবের চেয়ে উনিশ শতকে রচিত পুঁথিসাহিত্যের সঙ্গেই *বিষাদ-সিন্ধু*র মিলের আধিক্য। ফকির গরীবুল্লাহ(১৬৮০–১৭৭০) রচিত *জঙ্গনামা– মোক্তাল হোসেন* কাব্যের সঙ্গে *বিষাদ-সিন্ধু*র বেশ কিছু মিল লক্ষণীয়। সে-সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে ব্যবহৃত উপকরণের মিল-অমিলের বিষয়টিও খোলাসা করা যায়।

মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে 'বিষাদ-সিন্ধু' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কাজী আবদুল মান্নানের 'বিষাদ-সিন্ধু : কাহিনির উৎস বিচার' নামক প্রবন্ধে পুঁথির সঙ্গে ঐতিহাসিকতার অনেক অমিল দেখানো হয়েছে। (১৯৯১ : ২৮)। কারবালা ট্রাজেডি বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী থেকে শুরু করে হানিফার বন্দিত্ব এমনকি এজিদ বধ পর্যন্ত নানা স্থানে কল্পনামণ্ডিত সূত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন ব্যবহার করা হয় পুঁথি সাহিত্যে।

অন্যদিকে ইতিহাসগ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে আমরা সেসবের সত্যাসত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। যেমন : জিব্রিল ফেরেশতা এসে যেভাবে হাসান-হোসেন(রা.)-এর জীবনের মর্মান্তিক পরিণাম সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন তা সর্বৈব ইতিহাস সমর্থিত নয়।(কাসীর ২০০৪ : ৩৪১)। সেখানে অলৌকিকত্ব আরোপের বিষয়েও এসেছে ভিন্নতা। প্রকৃত ঘটনা সম্রাট এজিদের মক্কা-মদিনায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বাধা। এরপর একসময় ঘটনাক্রমেই হোসেন(রা.) ইরাকবাসীর আমন্ত্রণে পারস্যের দিকে রওয়ানা হয়। এই সিদ্ধান্তে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চেয়ে আবেগই অধিকতর দায়ি বলে ভাবা হয়। কারণ মদিনার বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইমাম হোসেন(রা.)কে পরিবার পরিজন সমেত এ-যাত্রায় নিষেধ করেন। মুয়াবিয়া পরবর্তীকালে ইসলামের খলিফা পদটি অধিক কণ্টকাকীর্ণ হয়ে ওঠে। উমাইয়া আর আব্বাসীয় দুই অংশে বড় বিভাজন ঘটে। খলিফা উসমান(রা.) হত্যার পরপরই প্রচণ্ড এক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এ-কারণে হযরত আলীর(রা.) খিলাফত কখনোই নিষ্কণ্টক ছিল না। এসময় পুরনো আরব গোত্রবাদ জেগে ওঠে।[২] গোত্র-বিরোধ ও সংঘর্ষ পুরনো আরব ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। বস্তুত উসমান হত্যার পর থেকেই আরবের পুরনো গোত্রবাদ জেগে ওঠে। উমাইয়া বংশের মুয়াবিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ চায় হযরত আলীর কাছে। আর এর গোপনে ছিল মুয়াবিয়ার রাজ্য বা সালতানাতের প্রতি মোহ। মুয়াবিয়ার শাসন কাল থেকেই ক্রমশ রাজতন্ত্রের দিকে ঝুকে পড়া ইসলামী খিলাফত অনিরাপদ হয়ে উঠতে থাকে। এজিদকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করা তারই একটা ধারাবাহিকতা বলে স্বীকৃত। কারবালা যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনায় ইসলামী বিশ্বের নতুন

---

২. ইসলাম পূর্ব আরবের ইতিহাস থেকে জানা যায় উমাইয়া আর আব্বাসীয়দের পুরনো দ্বন্দ্বসূত্র। আমরা ধারণা করি এই দ্বন্দ্বই পরবর্তীকালে কুরাইশদের মধ্যে উমাইয়া-আব্বাসীয় নামে দ্বিবিভাজনকে শক্ত করে। তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের খ্যাতিমান বণিক ফিহ্‌রকে কুরাইশদের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। ফিহ্‌র নবী ইব্রাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাইলের উত্তরসূরি। ফিহ্‌র-এর উত্তরসূরি ক্বাসা পঞ্চম শতাব্দিতে ক্বাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। ক্বাসার উত্তরাধিকারী আব্দুস শামস। আব্দুস শামস ক্ষমতা হস্তান্তর করেন পুত্র হাশিম-এর কাছে। হাশিমের নামানুযায়ী এই হিশাম গোত্রেই নবী মুহম্মদের জন্ম। হাশিম মৃত্যুবরণ করেন ৫১০ খ্রি.। হাশিমের ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল মুত্তালিব (রসুলের দাদা) চাচার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। আব্দুস শামসের আরেক পুত্র উমাইয়া হাশিমের পুত্রদের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ক্বাবার দায়িত্বপালনে তখন থেকেই একটি রেষারেষির সম্পর্ক তৈরি হয়। (দ্রষ্টব্য: এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ ১৯৯৭ : ৫৭)। ঐতিহাসিকগণের এই বিবরণ, উমাইয়া-আব্বাসীয়রা নবী মুহম্মদের জীবিতকালীন সময় এক থাকলেও পরবর্তীকালে আরব গোত্রবাদের সুপ্ত বীজ জেগে ওঠে। খলিফা ওসমান হত্যাকাণ্ড সেখানে একটি বিরাট উপলক্ষ্য। এই ঘটনা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির হাত ধরে কারবালা পর্যন্ত গড়ায়।

মেরুকরণ সূচিত হয়। উমাইয়াদের স্থলাভিষিক্ত হয় আব্বাসীয় রাজবংশ। বলা বাহুল্য, এই নতুন রাজবংশের প্রথম সম্রাট ইব্‌নে আব্বাস(রা.)। তিনি নবি মুহম্মদ(সা.)-এর চাচাত ভাই। এই ইব্‌নে আব্বাসই ইমাম হোসেনকে কারবালার দিকে যাত্রা করতে নিষেধ করেছিলেন। যে-অলৌকিকত্ব হোসেন চরিত্রে আরোপ করা হয়েছে কারবালা যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে, তার সঙ্গেও ইব্‌নে আব্বাসের যোগ রয়েছে। মাওলানা গরিবুল্লাহ মাসরুর রচিত *কারবালার ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ : "ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন যে, একদা দুপুর বেলা আমি ঘুমাচ্ছি। স্বপ্নে রসুলুল্লাহকে দেখলাম। তার চুল মোবারক এলোমেলো এবং ধুলাবালিযুক্ত। হাতে একটি রক্তপূর্ণ শিশি। এই অবস্থা দেখে আমি আরজ করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক, আপনাকে আজ এই রকম বিষণ্ন দেখছি কেন এবং আপনার হাতে এটা কি? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এটা হুসাইন এবং তার সঙ্গীদের রক্ত। আজ সকাল থেকেই আমি এই রক্ত সংগ্রহ করছি।"(মাসরুর ২০১৩ : ৯৮)। এই অংশটি নেয়া হয়েছে লেখক-উল্লিখিত ইমাম আহমদ ও বায়হাকী থেকে। ইমাম হোসেনের(রা.) ইরাক অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে ঘনীভূত একটা জটিলতা আঁচ করতে পেরেছিলেন ইব্‌নে আব্বাস। এ নিয়ে তাঁর ছিল তীব্র মানসিক চাপ। এটাও বিচার্য যে, দৈবে বিশ্বাস হোসেন(রা.) চরিত্রের একটা বড় বিষয় ছিল। সে-কারণেই তাঁকে যৌক্তিকভাবে শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউই ইরাক অভিমুখে তথা কারবালা যাত্রা ঠেকাতে পারেনি। মাওলানা মাসরুর আরো উল্লেখ করেন, হোসেন(রা.) নিজেও নাকি একটি স্বপ্ন দেখেন। উল্লেখ্য, সেই স্বপ্নের বিষয়বস্তু তিনি কস্মিনকালেও কারো কাছে খোলাসা করেননি। বরং ইরাক অভিমুখে যাত্রার বিষয়টি ছিল অনিবার্য, নানাভাবেই বিশ্বাসের অংশীভূত। তবে *বিষাদ-সিন্ধু*তে নানাভাবেই হোসেনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব বিষয়ে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিকভাবেও স্বীকৃত। আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য, ইমাম হোসেনের কুফাযাত্রার সংবাদ শুনে কিছু লোক বাধা দিলেও সে বাধা অপসারণের উপায় ছিল না। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আরবের সুপ্রসিদ্ধ কবি ফারাজ্‌দাকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইরাক থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁরা পরস্পর আন্তরিক কথোপকথন করেন। এর প্রধান বিষয় ছিল কুফাবাসীর অবস্থা সম্পর্কে জানা। কাব্যের ভাষায় কবি ফারাজ্‌দাক বলেন, 'আপনি এমন লোককে জিজ্ঞেস করেছেন– যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কুফাবাসীর ভালবাসায় জগতে আপনি 'সম্রাট' হয়ে আছেন। কিন্তু তাদের তরবারি বনী উমাইয়াদের পক্ষেই খাপমুক্ত হয়েছে।' (ফারুকী ২০১৭ : ১০৩)। কিন্তু কবি ফারাজ্‌দাকের এই উক্তিও তাঁকে স্বচালিত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে নিতে ব্যর্থ হয়। বরং তিনি এখানেও 'তক্‌দীরের ফয়সালা' বলে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। ইমাম হোসেনের মহানুভবত্ব বা বীরত্ব এমনকি চরিত্রের দৃঢ়তা ও

নিরাপোষ অভিব্যক্তি সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকদের কোনো দ্বিমত নেই। সংবাদ শোনামাত্র হোসেনের কুফা যাত্রা রোধ করার জন্য মক্কার গভর্নর আমর ইবনে সাইদ একটি নিরাপত্তা নামা লিখে দেন। এমনকি তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের ভাই ইয়াহিয়া ইবনে সাইদকেও পাঠান। কিন্তু গভর্নরের এই পত্র দেখিয়েও তাঁকে নিরত করা যায়নি। বহু পীড়াপীড়ির পর তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কারণ বর্ণনা করে। তিনি বলেন : "আমি নানাজানকে স্বপ্নে দেখেছি– স্বপ্নে তিনি আমাকে একটি নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র নানাজানের ঐ নির্দেশটি পালন করার জন্যই আমি সেখানে যাচ্ছি। আর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমার ওপর যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক, আমি বরদাশত করে যাব।' (ফারুকী ২০১৭ : ১০৫)। তারা প্রশ্ন করলেন– 'স্বপ্নের ঐ নির্দেশটি কি আমরা জানতে পারি?' উত্তরে হযরত হুসাইন বললেন– 'এ পর্যন্ত আমি সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলিনি। ভবিষ্যতেও কাউকে বলার ইচ্ছা আমার নেই এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার আগে কাউকে আমি স্বপ্নের সে নির্দেশটি বলব না।" (কাসীর ২০০৩ : ২৭৫-২৭৭)। প্রমাণ অসঙ্গত নয় যে, এই ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের প্রভাব *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসের ধর্মীয় চরিত্র নির্মাণে সাহায্য করেছে। কিন্তু উপন্যাসের মৌল ভাব-কল্পনা তৈরিতে লেখক যে-ঐতিহ্যের নবনির্মাণ করেন সেখানে ইতিহাসের চেয়ে মানবজীবনের অনিবার্য শক্তিসূত্রগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসকে দৈব ও অলৌকিক বিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে বের করে নিয়ে আসাই একজন ঔপন্যাসিকের কাজ। প্রকৃত ঘটনা-বিশ্লেষণে মানব জীবনের বৃহত্তর সত্য ও ইঙ্গিতের দিকেই লেখক-মনোভাব অগ্রবর্তী হয়। যে-কারণে *বিষাদ-সিন্ধু*র অনেক অলৌকিকত্ব সত্ত্বেও হয়ে ওঠে রক্ত-মাংসসম্ভূত মানুষের কাহিনি।

মীর মশাররফের বড় কীর্তি আরবীয় সভ্যতা ও ইতিহাসকে স্বদেশীয় সংস্কৃতি-সংশ্লেষে আলোকে গড়ে তোলা। একটি উপন্যাস-নির্মাণে এটি বড় শর্ত– কাহিনির পটভূমি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপন। সেই সঙ্গে পাঠকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করার জন্য প্রয়োজন স্বীয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণ। তাছাড়া লেখকের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাও অনেক সময় কাহিনির গতি নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। যেমন স্বপত্নীবাদের কলহ লেখকের ব্যক্তিজীবনপ্রসূত। *বিষাদ-সিন্ধু*তেও রয়েছে স্বপত্নীবাদ। তবে সেটার বিষয়ে আরবীয় ইতিহাস সরব নয়। ষড়যন্ত্রী মন্ত্রী মারওয়ান কুচক্রী মায়মুনার মাধ্যমে জায়েদার সাহায্যে হীরকচূর্ণ দ্বারা ইমাম হাসানের প্রাণ বিনাশ করে। তবে 'মীরের ব্যক্তিজীবনের ঘটনার প্রবল এই অভিঘাত যদি না থাকত, তাহলে তিনি এত তীব্রভাবে বিষাদ-সিন্ধুতে প্রকাশ করতে পারতেন না।'(কায়সার ২০১৫ : ৪০)। ইতিহাসে এই ব্যক্তিজীবনের অলিগলি সন্ধানের কোনো প্রচেষ্টা নেই। বরং বাহ্যিক ঘটনার বিবরণই সেখানে যথেষ্ট। কিন্তু উপন্যাস ব্যক্তিবিকাশের পথ-উন্মোচন করে। অন্যদিকে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের ব্যক্তিবিকাশ-রুদ্ধ পরিবেশে একজন

নারীর মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষার বিস্তার ঘটানো অসাধারণ শিল্পবোধেরই প্রকাশ। এ-কারণেই নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে একমাত্র জায়েদা চরিত্রটিই উপন্যাসে উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট।

হানিফা চরিত্র কিছুটা ঐতিহাসিক কিছুটা লেখকের হাতে নির্মিত উপন্যাস-মানব। মোহাম্মদ হানিফার বীরত্ব অবিসংবাদিত। স্বজাতি, আত্মীয়-বেদনায় সে কাতর। ইমাম হোসেন, কাসেম, শিশুপুত্রসহ অনেকের মৃত্যু তার মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি করে। আরো বেশি বিক্ষোভ তৈরি করে এজিদের শঠতা। "মোহাম্মদ হানিফা বীরদর্পে বীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এই অসি ধারণ করিলাম, বীরবেশে সজ্জিত হইলাম, —আর ফিরিব না, তরবারি কোষে আবদ্ধ করিব না।" (*বিষাদ-সিন্ধু*, পৃ. ২৪১)। সীমাহীন যুদ্ধ, বহু প্রাণক্ষয়, অসীম বীরত্ব দিয়ে জয়ী হয় সে। মদিনা-মসনদের একমাত্র উত্তরাধিকারী জয়নাল আবেদীনকে সিংহাসনে বসান এবং কারবালা যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিশোধ তার প্রধান প্রতিজ্ঞা। কিন্তু জয়ের উল্লাস করার সামর্থ্য নেই তার। 'এজিদ-বধ পর্ব', 'প্রথম প্রবাহে' তার শূন্য-হৃদয়ের হাহাকারের বাণীকে প্রতিফলিত করেন লেখক। এই প্রকাশের ভাষায় রয়েছে লেখকের শিল্পকুশলতার স্বাক্ষর।

> কই এজিদ? কই তাহার শিবির? কিছুই তো চক্ষে দেখিতেছি না। প্রভু হোসেন! তুমি কোথায়? এ দৃশ্য তোমাকে দেখাইতে পারিলাম না। আহা কাসেম! মদিনার শ্রেষ্ঠ বীর কাসেম! একবিন্দু জলের জন্য হায়! হায়! একবিন্দু জলের জন্য কী না ঘটিয়াছে! উহু! কী নিদারুণ কথা! পিপাসায় কাতর হইয়া প্রভুপুত্র আলী আকবর পিতার জিহ্বা চাটিয়াছিল! হায়! হায়! সে দুঃখ তো কিছুতেই যায় না। (*বিষাদ-সিন্ধু*, পৃ. ২৫৪)

তবে হানিফা চরিত্রে অসীম বীরত্বের স্বাক্ষর থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। তার জন্য দায়ী হানিফার ক্রোধ ও আক্রোশ। প্রতিশোধের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে কখনো কখনো সে স্বাভাবিক বোধশূন্য মানুষে রূপান্তরিত। তার যথাযথ ফলও সে পেয়েছে। এজিদ তার হাতে বধ্য নয়—এ-ভবিষ্যৎবাণী শুনেও সে ক্ষান্ত হয়নি। বরং এজিদকে বধ করাই হয়ে উঠল তার চরম লক্ষ্য। এজন্য এর প্রায়শ্চিত্তও তাকে করতে হয়—পর্বতগাত্র-বেষ্টিত হয়ে মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত বন্দিত্ব বরণ। মানবজীবনের অন্তর্গূঢ় সত্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে *বিষাদ-সিন্ধু*র হানিফা। হযরত আলীর এক পুত্র হানাফিয়ার নাম (*বিষাদ-সিন্ধু*তে হানিফা) ইতিহাসে পাওয়া যায়। (Houtsma : ৮৮)। এ-চরিত্র নিয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক দ্বৈধতা। ইতিহাসে উল্লেখ, যার নির্দেশে হোসেনকে হত্যা করা হয় সেই আব্দুল্লাহ জেয়াদকেও পরবর্তীকালে হত্যা করা হয়। হোসেন-হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় মুখতার কিংবা মুহাম্মদ হানিফা। (আউয়াল ২০০০: ৬৭)।

*বিষাদ-সিন্ধু*র কাহিনি একাধারে ইতিহাস, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি। উপন্যাসকারের অন্তস্থ আবেগ দিয়ে বিষয়গুলো চমৎকারভাবে একীভূত হয়েছে। অন্যদিকে উপন্যাসের গঠনশৈলীর দিক থেকেও এর টাইপ চরিত্রসমূহ ব্যতিরেকে অন্যান্য চরিত্র যথেষ্ট বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক একটি মানবীয়তা-পুষ্ট কাহিনি-কাঠামো ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশালতার ব্যাপ্তি নিয়ে এ-কাহিনি মহাকাব্যিক হয়ে ওঠে। ঘটনা সবার অবগত, তবুও লেখকসৃষ্ট নাটকীয় সাসপেন্স পাঠককে শেষপর্যন্ত ধরে রাখে। ভাবগাম্ভীর্যময় বর্ণনাভঙ্গি, লেখকের দার্শনিক জীবন-ভাবনা মহাকালের দিকে টেনে নিয়ে যায়। প্রকৃতি, পরিবেশ, ভূগোল ইত্যাদির কল্পিত অথচ বাস্তব উপস্থাপনায় পাঠকের মনোভূমিতে ছবির পর ছবি ধরা পড়ে। ঘটনাকে বেশি বিস্তৃত করার জন্য কোথাও কোথাও অতিকথনের আশ্রয় নিয়েছেন লেখক। উপন্যাসে অতিকথনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না সবসময়। তবে অলৌকিক বিষয়ের উপস্থাপনা আধুনিক উপন্যাসকে অনেকখানি দুর্বল করে দেয়। *বিষাদ-সিন্ধু*তে অলৌকিক বিষয়বস্তুর উপস্থিতি যৌক্তিক পাঠকের চোখে ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য লেখক নিজেই সেসব অলৌকিক বা আধিভৌতিক বিষয় স্বীকার করে নেন। তিনি পূর্বেই ইঙ্গিত করেন, যাতে পাঠক দৃশ্যমান সত্যের জন্য ব্যস্ত না হয়ে ওঠে। এটি ঔপন্যাসিক হিসেবে শিল্পীর সততা। আর কাহিনি সম্পর্কে এই মনোভাব লেখককে দায়মুক্ত করে অনেকখানি।

*বিষাদ-সিন্ধু*র প্রথম পর্ব 'মহরম পর্ব'। সর্বমোট ছাব্বিশটি উপপর্ব-সমন্বয়ে এ-পর্বটি গড়ে উঠেছে। উপপর্বসমূহকে তিনি 'প্রবাহ' নামে চিহ্নিত করেছেন। 'মহরম পর্ব' শুরু হওয়ার আগেই একটি ভূমিকা অধ্যায় যুক্ত। যে-অধ্যায়টির বিষয়বস্তু পরিপূর্ণভাবে ধর্মীয় ভবিষ্যৎ বাণীনির্ভর। ইসলামের রসুল ও তাঁর সাহাবি মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত একটি বিশেষ ঘটনা এখানে স্থান পেয়েছে। মুয়াবিয়া রসুলের নিকট জানতে পারেন যে, ইমাম হাসান ও হোসেনের হন্তারক হবে কোনো এক সাহাবি পুত্র। মুয়াবিয়া এ-ঘটনা শুনে অকৃতদার থাকতে চান। কিন্তু থাকতে পারেননি। ঐশ্বরিক ইচ্ছায় রোগজনিত কারণে তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। মাবিয়ার ঔরসে জন্মায় প্রফেট-দৌহিত্রের হন্তারক এজিদ। এই ভবিষ্যৎবাণীর বিষয়কে লেখক সুকৌশলে মূল কাহিনির বাইরে 'উপক্রমণিকা' অংশে রাখতে চেয়েছেন।

বিষাদ-সিন্ধু রচনাটির উল্লেখযোগ্যতা এর শিল্পসমৃদ্ধি। এই সমৃদ্ধি ঘটাতে লেখক চরিত্রগুলোকে যথাসম্ভব মানবীয় করে উপস্থাপন করেন। মানবজীবনের তৃপ্তি-অতৃপ্তি, কামনা-বাসনার উদগ্র যন্ত্রণা ও প্রেমবিহীনতা যার অন্যতম কারণ। এজিদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এজিদ চরিত্রের জন্যই উপন্যাসটি টিপিক্যাল ধর্মীয় কাহিনির বাতাবরণমুক্ত। সে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে পরাভূত এক মানবসত্তা। রক্ত-মাংসের সজীব মানবের প্রতিচ্ছায়া আছে এ-চরিত্রে। 'মহররম পর্ব' শুরু হয় চরিত্রটির প্রেম ও

অস্থিরতা দিয়ে। মাবিয়া তার পুত্রকে নিরীক্ষণ করে সহানুভূতি দিয়ে। কিন্তু কেবলি রাজাভিষেক তো এজিদের আকাঙ্ক্ষা নয়।

> হয় দেখিবেন না হয় শুনিবেন—এজিদ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশ নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোনো নির্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্রধামে চলিয়া গিয়াছে। (প্রাগুক্ত : ২)

আব্দুল জব্বারের সুন্দরী ভার্যাই তার প্রেম-যন্ত্রণার মূল। মৃগয়ায় যেদিন সে যায়, সবার মধ্যে ছিল ঔৎসুক্য। একমাত্র জয়নাবই সেদিন মুখ ফিরিয়ে কপাট বন্ধ করে। আর সমস্ত দামেস্কবাসী সেই গবাক্ষ দ্বার দিয়ে সহস্র সৈন্য-বেষ্টিত এজিদের শৌর্য ও শান-শওকত প্রত্যক্ষ করে। এজিদের আক্রোশ ও আকাঙ্ক্ষা অবিমিশ্র রূপ পায় সেদিনই। জয়নাবকে পাবার ব্যাকুল প্রত্যাশায় নিমগ্ন হয় সে। কিন্তু ইমাম হাসানের সঙ্গে জয়নাবের পরিণয় বন্ধন এজিদের ভেতর তৈরি করে তীব্র সংক্ষোভ। কিছুতেই যেন তার অন্তরের আগুন নির্বাপিত হবার নয়। এমনকি পিতা মাবিয়ার ধর্মোপদেশেও তার অন্তর বিগলিত হয় না।[৩] কিন্তু এজিদের পক্ষে পিতৃআজ্ঞা পালনীয়– বিবেচিত হয় না। জয়নাবকে পাবার চেয়ে আর কিছুই বড় নয় তার কাছে। এই সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা ও রূপানলে দগ্ধ হওয়াই যেন *বিষাদ-সিন্ধু*র ঘটনার মূল। এজিদই ইতিহাসের গতি-নিয়ন্ত্রক। এজিদ চরিত্রের মানস-সঙ্কট হাজির করাই লেখকের অনন্য কীর্তি। ইতিহাস-উল্লিখিত ইমাম হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে তা শিল্পিত আখ্যান হয়ে ওঠে। বন্দি জয়নাবের প্রতি এজিদের ব্যাকুল আত্মনিবেদনে লাম্পট্যের চিহ্নমাত্র নেই। 'উদ্ধার পর্বে'র 'তৃতীয় প্রবাহে' বিদীর্ণ প্রেমিক হৃদয়ের শতধাচূর্ণ বিলাপে সেটাই উদ্ভাসিত :

> সে দিনের সে অহঙ্কার কই? সে দোলায়মান কর্ণাভরণ কোথা? সে কেশশোভা মুক্তার জালি কোথা? এ ভীষণ সমর কাহার জন্য? এ শোণিতপ্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ? কি কারণে আপনার চক্ষের বিষ? কি কারণে দামেস্কের পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা? (*বিষাদ-সিন্ধু*, পৃ. ১৪৫)

---

৩. 'মহরম পর্ব', '৬ষ্ঠ প্রবাহে' উল্লেখ, মাবিয়া পুত্র এজিদকে বলছেন : "পৈতৃক ধর্ম রক্ষা কর। পরকালের সুগম্য পথের দুরূহ কণ্টক সত্যধর্মের জ্যোতিপ্রবাহে বিনষ্ট করিয়া স্বর্গের দ্বার আবিষ্কার কর। ... আমি যে প্রকারে ইমাম হাসান-হোসেনের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তুমি তাহার চতুর্গুণ করিবে। তোমা অপেক্ষা তাঁহারা সকল বিষয়েই বড়।" (*বিষাদ-সিন্ধু* : ২০)

*বিষাদ-সিন্ধু*তে এজিদের খেদোক্তির মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির শুরু ও শেষ। কারবালার কাহিনি 'মহররম পর্বে'ই সমাপ্ত হতে পারত। ধর্মীয় কাহিনি পুরোটা ব্যক্ত করার আগ্রহ থেকেই লেখক 'উদ্ধার পর্ব' শেষ করেও 'এজিদ বধ' পর্ব পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। উপন্যাসের মধ্যপর্ব জুড়ে প্রায় অনুপস্থিত এজিদ চরিত্রের পরিণতি দেয়াও যেন তাঁর একটি প্রধান লক্ষ্য। মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম বলেন, 'এজিদ-অন্তরের অপ্রতিরোধ্য রূপতৃষ্ণা 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। রিপুশাসিত, আবেগময়, পৌরুষদৃপ্ত একটি বলিষ্ঠ মানুষ লেখকের শিল্পসৃষ্টিতে নায়ক মহিমায় উদ্ভাসিত।' (১৯৯১ : ২৩)। তাই বলা যায় :

> ইতিহাসের প্রকৃত মরুপ্রান্তর নয় এজিদের প্রেমদীর্ণ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে। বিষাদের উত্তাল তরঙ্গসমূহের উৎস এজিদের হৃদয় সিন্ধু। (চৌধুরী ১৯৯১ : ১৬)

বিষাদ-সিন্ধুতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্র বিশেষত ইমাম হাসান, হোসেন, হানিফা সকলেই একধরনের স্থিরচরিত্র। ধর্মীয় আবেশের বাইরে লেখক তাদেরকে অবস্থান করাতে পারেননি। পারিপার্শ্বিক কারণেই তিনি কল্পনার রাশ টেনে ধরতে বাধ্য। কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনার সত্য উপস্থাপনের ঔচিত্যবোধ সত্ত্বেও এজিদের অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত রূপমুগ্ধ হৃদয় মশাররফের শিল্পীসত্তাকে আকৃষ্ট করেছে। আবু হেনা মোস্তফা কামালের বক্তব্য :

> কারবালা ট্রাজেডির হতভাগ্য নায়ক হোসেনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপ্রতুল না-হলেও শিল্পী মশাররফ এজিদ-চরিত্র রূপায়ণেই তাঁর শ্রেষ্ঠ মনোযোগ অর্পণ করেছিলেন। ... একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে অন্যায় সমরে তিনি ব্যথিত, বেদনাতুর—আবার শিল্পী হিসেবে এজিদ-চরিত্রের বিচিত্র সম্ভাবনা উপেক্ষা করতেও তিনি অপারগ। এজিদের শঠতা, হৃদয়হীনতা, পররাজ্যলোলুপতা—সবকিছুর কেন্দ্রে মশাররফ চোখে সেই সর্বগ্রাসী রূপজ মোহ যার উত্তাপ এই উপাখ্যানের ওপর দিয়ে দাবানলের মতো প্রবাহিত। (১৯৯১ : ৩৫)

দুষ্ট-খল-বিধ্বংসী-অহংকারী, আত্ম ও পরপীড়ক এজিদ চরিত্র অঙ্কনে মশাররফ তাঁর কল্পনা-প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেছেন। এজিদ পিতৃআদেশ অমান্যকারী। পিতা গত হওয়ার পর তার উচ্ছৃঙ্খল জীবন হয়ে ওঠে একেবারেই লাগামহীন। এজিদ কুচক্রী, নিষ্ঠুর, ভোগাকাঙ্ক্ষী, উৎকোচ দাতা, রাজক্ষমতার অপব্যবহারকারী। হাসান-হোসেন সম্পর্কে পিতৃআদেশও অমান্যকারী। পিতার বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্রদের ওপরও সে খড়্গহস্ত। সে দামেস্ক রাজদরবারে হোসেনের কর্তিত মস্তক

অবমাননাকারী, পরিবারের শিশু সন্তান দিয়ে খেজুরের প্রলোভনে হোসেন-মস্তক থেকে কাপড় সরিয়ে হৃদয়ে তীব্র বেদনা উদ্রেককারী। ইসলাম ধর্মে খোৎবায় হযরত মুহম্মদ (সা.), চার খলিফা ও তাদের পরিবর্গের নাম উল্লেখ থাকে। কিন্তু বিজয়ী এজিদ হোসেন শিবিরে বেঁচে থাকা একমাত্র উত্তরাধিকারী জয়নাল আবেদীনকে দিয়ে নিজের নামে ধর্মোপাসনালয়ে খোৎবা দিতে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র করে।

উপন্যাসে এজিদের সীমাহীন ছলনা, হাসান-হোসেন হত্যা ও তার পরিবারের লাঞ্ছনা, সহস্র মানুষের শোণিতপ্রবাহ—এ-সবেরই মূলে আছে জয়নাবের প্রতি তার রূপতৃষ্ণা। তাকে পাওয়ার বাসনায় উদ্বেল এজিদ বাক্যহারা। দরবারে সুরাপানগ্রস্ত একাকী এজিদ-মনের সুতীব্র যন্ত্রণার ভাষা ধারণ করেছেন মশাররফ। সেখানে পাপিষ্ঠ মানবাত্মার কনফেশনই স্পষ্ট। 'উদ্ধার পর্বে'র উনত্রিংশ প্রবাহটি এজিদের সাংঘাতিক মনোদহনের স্বাক্ষর। আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত মানব-হৃদয়ের বিফলতা যার পরতে পরতে। *বিষাদ-সিন্ধু*র ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরে এজিদ-সত্তার মর্মবিদারী হাহাকারই এখানে সঞ্চিত। এজিদ যেন আর পাপীষ্ঠ নয়। কনফেশন বা আত্মপাপ স্বীকৃতির পরে সে পরিণত হয়েছে শুধুই এক ব্যর্থতম মানুষে। প্রবল প্রেমাকাঙ্ক্ষা মানবজীবনকে পর্যুদস্ত করে দেয়। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে তথা রাষ্ট্র বা রাজ্যবিস্তারের পরও ব্যর্থ প্রেমের তীব্র হলাহল পান করে সে। জয়নাব-হৃদয়ের কাছে পরাস্ত এজিদের নিরুচ্চার রুদ্ধশ্বাস আবেগের ঘনঘটার প্রমাণ উপস্থিত করেন লেখক। 'উদ্ধার পর্ব', 'উনত্রিংশ প্রবাহে' এজিদের প্রণয়ঘটিত আর্তস্বর প্রতিধ্বনিত। হানিফার আক্রমণে মন্ত্রী মারওয়ান, সীমারসহ অন্যান্য বীরের মৃত্যুও ক্রমশ পরাজয়ের গ্লানিতে মুহ্যমান। এজিদের অন্তর্যাতনা বড়ই মারাত্মক। নিষ্ঠুর ও পাপাত্মা এজিদের মধ্যেও মানবিক বেদনার সঞ্চার আমরা প্রত্যক্ষ করি। যে সীমারকে সে সুরাশক্তির ঘোরে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেছিল সেই মহাখল সীমারও নিহত হলে এজিদ বেদনার্ত হয়। 'উদ্ধার পর্ব', বিংশ প্রবাহে এজিদের সাংঘাতিক অসহায়ত্বই যেন দৃষ্টিগোচর হয়।

*বিষাদ-সিন্ধু*তে বর্ণিত এজিদ চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের এজিদের অনেক মিল-অমিল পরিলক্ষিত। এজিদ চরিত্রের শত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনাদীর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন কেউ কেউ; যেমন, একজন ঐতিহাসিকের ভাষ্য—"এজিদ নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসঘাতক। তাঁর প্রকৃতিতে কোনো দয়ামায়া বা নীতিবোধ ছিল না। হীনকাজে তার আনন্দ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরাও ছিল ক্ষুদ্র এবং নীচ ও কুচক্রী।"(Ali 1916 : 83)। অন্যদিকে শিয়া-সুন্নি ইতিহাসকারদের বিরোধ এমনকি একাধিক সুন্নি ইতিহাসের ভাষ্যও এজিদ চরিত্রকে রহস্যময় করে তুলতে বাধ্য। *বিষাদ-সিন্ধু*র সমাপ্তির দিকে স্বীয় জীবন রক্ষায় ব্যর্থ এজিদকে গুহায় আত্মগোপন করতে দেখা যায়। সেখানে সে অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত হতে থাকবে, সে অগ্নি নরকাগ্নিসম। আবার এ-গ্রন্থেরই 'তৃতীয়

পর্বে'র চতুর্থ প্রবাহে বলা হয়েছে, 'এজিদ কাহারো বধ্য নহে।' (*বিষাদ-সিন্ধু*, পৃ ২৭৩)। যদিও এজিদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাসের তথ্য ভিন্ন—তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যোসেফ হেল উল্লেখ করেন– এজিদ নিহত হয় ৭০৪ সালে। (১৯৬৯ : ৯১)। এহেন এজিদকে *বিষাদ-সিন্ধু*র অঙ্কন একান্তই ঔপন্যাসিক। ইতিহাসের সঙ্গে তার অমিল থাকলেও একটি অন্তঃপ্রবাহী রোষ যা ব্যক্তিগত প্রেম-উৎসারিত তা-ই এজিদে প্রধান। ধর্মীয় আবেগের তুলনায় সেখানে মানবায়ন প্রক্রিয়াই প্রধান বিবেচ্য।

খ. *বিষাদবিন্দু* : ঐতিহাসিকতা এবং তুলনা

শামিম আহমেদ-এর *বিষাদবিন্দু* নামক উপন্যাসটিও কারবালার ট্রাজিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে রচিত। এ-প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্য যাচাইপূর্বক বলা যায়—ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের ব্যবহারে *বিষাদবিন্দু* ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। *বিষাদবিন্দু*র ব্যাপ্তি *বিষাদ-সিন্ধু*র মতো নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য এই ব্যাপ্তি অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল বিষয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের তথ্য ও সত্যতা, অন্তর্গত স্পিরিটকে ব্যবহার করার ক্ষমতা। এ-উপন্যাসেও *বিষাদ-সিন্ধু*র মতো এজিদই হয়ে উঠেছে নায়ক। তাছাড়া ইমাম হাসান-হোসেন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রসহ ইতিহাসের বহু অনালোকিত অধ্যায়কেও লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ-উপন্যাসেও ইতিহাসের তথ্যের বাইরে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের অন্তঃকরণ-আবিষ্কার।

*বিষাদ-সিন্ধু*র শুরু একটা মিথিক্যাল ঘটনা দ্বারা। তারপর পারস্যে মুয়াবিয়ার রাজপ্রাসাদে কাহিনির আরম্ভ। ইতিহাসের এজিদ আর এই উপন্যাসে গড়ে তোলা এজিদের বেশ খানিকটা নিদর্শন ক্রমশই আবিষ্কার-সম্ভব। *বিষাদবিন্দু* শুরু হয়েছে এজিদের জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে, যে বৃত্তান্ত *বিষাদ-সিন্ধু*তে নেই। এ-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে এজিদের মা মাইসুন বিবি ও তার পিতৃপরিবারের কথা। এজিদের জন্ম-প্রক্রিয়ার পরিবেশ এখানে বাঙ্ময়। সে-সঙ্গে ইতিহাস-উদ্ধৃত এজিদের জন্মমিথকেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

> মাইসুন বিবি তার নাম দেন 'এজিদ'– যে মহান হতে চলেছে। হঠাৎ খেয়াল করেন আঁতুরঘরের আগুন যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। (আহমেদ ২০১৩ : ১০)
>
> শিশুটি প্রচণ্ড জোরে শব্দ করে ওঠে। সেই ডাক ভীত গাধার চেয়েও ভয়ঙ্কর। মরুভূমির পশুরাও যেন পাল্লা দিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে। (*প্রাগুক্ত*)

নবি মুহম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যৎবাণীর উল্লেখ এখানেও রয়েছে। মহানবি নাকি ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন, মাবিয়ার পুত্রকে দুনিয়ার অর্ধেক লোক ভয় পাবে। মাবিয়া

তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি বিয়েই করবেন না। অবশেষে তিনি বিশেষ ব্যাধি-মুক্তির নিমিত্তে বিয়েতে বাধ্য হন। এজিদ মাতৃগর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাইসুন বিবিকে তালাক দেন মাবিয়া। তাকে পাঠানো হয় তার খ্রিস্টান পিতা বাখদাল কালবির বাসস্থান বেদায়িতে। এই বেদায়িতে বাস বেনি কেলব উপজাতির। রাত্রিতে সেখানে নেমে আসতো ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। মাইসুন বিবি অনেক দিন ধরেই মাবিয়ার সাম্রাজ্য থেকে এই অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন চান। এই মাইসুন বিবি একজন কবি, রাজনীতিজ্ঞ। এদিকে মাবিয়া প্রায় বিস্মৃত যে, মাইসুন বিবির পুত্র গোকুলে বাড়ছে। এজিদের প্রশ্ন জাগে কে তার পিতা? মাইসুন বিবি সে জবাব দেয় কবিতায় :

> ...ওহে পুত্র, বসে থাকো কোলে/তোমার বাপ রাজার রাজা/মাথায় তাঁর রাজমুকুট/দামেস্কের খলিফা তিনি/তিনি যদি জানেন তোমার জন্ম /ভয়েই তখন মারা যাবেন। (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ১২)

মাতৃআজ্ঞায় এজিদের আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশার স্বপ্নরাজ্য ক্রমশ গড়ে ওঠে। তারও ইচ্ছে জাগে, বড় হয়ে সে শিরাজি খাবে আর খামারিয়া লিখবে। কিন্তু তার পোষা বাঁদর, ব্যাঙ, টিকটিকি, আরশোলারা তাকে ভীষণ জ্বালাতন করে। ফলে ঠিকমত লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। বই নিয়ে বসলেই বাঁদরটি হাত থেকে বই কেড়ে নেয়। কিন্তু মায়ের কাছে সে পায় প্রবল এক জ্ঞানবিশ্ব। তারই কাছে সে আফলাতুনের (প্লেটো) গল্প শোনে। আরুস্তাতালিসের (এরিস্টটল) কাহিনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লে মা তাকে ঠেলে জাগিয়ে দেন। (*বিষাদবিন্দু*, ১৩)। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, এজিদ নানারকম প্রাণির সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। আরব ঐতিহাসিকরাও এই চরিত্র খনন করে বের করে এনেছেন অজানা সব তথ্য। যেমন জোসেফ হেল(১৮৭৫-১৯৫০) তাঁর *আরব সভ্যতা*(১৯৬৯)নামক গ্রন্থে উমাইয়া বংশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। সেখানে কলাবিদ কবিতা আর সঙ্গীতের আসরে বিমুগ্ধ উমাইয়াদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মুয়াবিয়া পরবর্তী উমাইয়া বংশের শাসকরা কীভাবে প্রমত্ত জীবনকে ধারণ করেছিলেন তারও বিবরণ রয়েছে। এজিদ চরিত্র সম্পর্কে সেখানে নেতিবাচক তেমন কিছুরই উল্লেখ নেই।

> ওমাইয়া বংশের ইয়াজিদ (মৃত্যু ৭০৪) সম্পর্কে আমরা জানি যে, একজন ফকিরের(সাধু) দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তিনি কিমিয়া অধ্যায়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রথমটিতে তাঁহার শিক্ষক এবং শিক্ষকের উপদেশাবলী বর্ণিত হইয়াছে। আরবদের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ কখন শুরু হইয়াছিল, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এমনকি, ঐতিহাসিক অধ্যায়নের আরম্ভ সম্পর্কে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, ওমাইয়াগণ দক্ষিণ আরবীয় সঙ্গীত ও কাহিনীর প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা ইতিহাস অধ্যয়নে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। (হেল ১৯৬৯ : ৯২)

উল্লেখ্য, বাগদাদে নানারকম সঙ্গীত ও সুরার প্রচলন ঘটেছিল উমাইয়াদের সময়ই। বাগদাদ দরবারে খ্রিস্টানদের উচ্চ সম্মান ছিল। গ্রিকচার্চের শেষ ধর্মবিদদের পিতা দামেশকের জন খলিফা আবদুল মালিকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। (হেল ১৯৬৯ : ৯২)। আমরা অবগত হই খ্রিস্টান কবি আখতালের কথা। তিনি ছিলেন এজিদের ঘনিষ্ঠ। এমনকি *বিষাদবিন্দু*তে জানা যায়, সাধু ইস্তেফান নামক একজন খ্রিস্টান শিক্ষককে এজিদ-পুত্র খালিদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি। এজিদ নিজেও তার খ্রিস্টান সাধুর কাছে প্লেটো-এরিস্টটলের (আফলাতুন-আরুস্তাতালিস) দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। গ্রিক দর্শনের সঙ্গে উমাইয়া ইসলামের মেলবন্ধন এভাবেই তৈরি হয়েছিল।

*বিষাদবিন্দু*র এজিদও *বিষাদ-সিন্ধু*র মতই ভাল-মন্দে মিশ্রিত মানুষ। বাস্তব ইতিহাস ও কল্পনার ত্রিধারায় গড়ে ওঠা তার চরিত্র। উপন্যাসে উল্লিখিত, এজিদ কিশোর বয়সে আত্মপরিচয়-অন্বেষণে ঘোড়া ছুটিয়ে মাবিয়ার রাজদরবারে উপনীত হয়। ভবিষ্যৎবাণী পুত্রস্নেহের কাছে নতিস্বীকার করে। স্নেহকাতর মাবিয়া তার ঔরসজাত সন্তানকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। সেদিন এজিদের কণ্ঠে নেমে আসে পিতৃবঞ্চনার রোষ। পিতাকে অধিকারের কর্কশ কণ্ঠে সে শোনায় :

> আমি নূর, আমার অন্তঃকরণ হল আলো। আমার ধমনিতে খুনের সঙ্গে সুরা বয়ে যায়। আমি তোমাদের জাহিলিয়াতের সব জ্ঞান, বই, পুঁথি, ধ্বংস করতে এসেছি। আমার নাম এজি। সেইসব উজ্জ্বল পোকামাকড় যারা গাছের রস খেয়ে বাঁচে আমি তাদের প্রভু। (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ১৫)

এজিদ যেন তখন থেকেই অপ্রতিরোধ্য এন্টি হিরো। এই পরিচয়ই *বিষাদবিন্দু*র বৃহত্তর অংশজুড়ে। তবে *বিষাদ-সিন্ধু*র মতো এ-উপন্যাসেও পাই দগদগে ঘাত-প্রতিঘাতের এক দুর্মর চরিত্রের সন্ধান। যেখানে ঔপন্যাসিক মেজাজেই কেবল একটি ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্গত বিচলিত ভাবকে রূপায়ণ করা সম্ভব। উপন্যাসে উল্লেখ যে, মোল্লারা এজিদকে কোরান শিক্ষার দেবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু এজিদ চায় অন্যকিছু। এজিদ জানাল, "মদ্যপান আইনসম্মত। পান কর কেননা এটা তোমার কর্তব্য।"(*বিষাদবিন্ধু*, পৃ. ১৬)। সুরা আর সঙ্গীতের দেবমানব এজিদ। দামাস্কার ওস্তাদ বাজিয়েরা তার 'ওউদ' বাজানো দেখে বিস্মিত হয়। বাদ্যযন্ত্র না বাজিয়েও সে যখন 'হুদা' সঙ্গীত ধরে, মনে হয় বসরা যেন উঠে এসে দামাস্কার ঘরে বাসা নিয়েছে। (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭)। মরুভূমির আত্মা আর জিনরা এই সঙ্গীত শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। 'ঘিনা' আর 'হাজাজ' প্রভৃতি সঙ্গীতেও রীতিমতো দক্ষ হয়ে ওঠে এজিদ। অন্যদিকে প্রেমিক এজিদ এক নিঃসহায় হৃদয়। তার বেহালার (রেবাব) মূর্ছনায় সুতীব্র বেদনা উদগলিত। তার হৃদয়তন্ত্রী ক্ষতবিক্ষত করে বহুপ্রজ প্রেম আর নারী। এজিদের এই দ্বন্দ্ব-পরাভুত ব্যক্তিপরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্যেই লেখক ইতিহাসের ধূলিধূসর পথ পরিভ্রমণ করেন। *বিষাদবিন্দু*র ভাষ্যে স্বভাব-উচ্চণ্ড

এজিদের কার্যকলাপেই মাবিয়া অসুস্থ হয়ে ওঠেন। পানভোজনরত এজিদকে ডেকে তিনি স্বীয় দুঃখ অপনোদনেরও পদক্ষেপ নিতে চান। *বিষাদ-সিন্ধু*তেও রয়েছে এ-চিত্র—পুত্রের মনের অবস্থায় শঙ্কিত পিতৃহৃদয়। *বিষাদ-সিন্ধু*র সৎ পরামর্শক মন্ত্রী হামান *বিষাদবিন্দু*তেও রাজদরবারে আসীন। উপস্থিত কুচক্রী মন্ত্রী মারওয়ান। এখানেও এজিদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা সে-ই। তার নির্দেশেই হাসানকে বিষপানে হত্যা, হোসেন-হত্যা নামক কারবালাকাণ্ড।

ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এ-উপন্যাসে রয়েছে সিফফিনের যুদ্ধ-প্রসঙ্গ যা, উসমান-হত্যার প্রতিশোধ রূপে হযরত আলীর সঙ্গে মুয়াবিয়ার স্পষ্ট বিরোধজাত। আলীকে খলিফা হিসেবে না মানা, জেরুজালেমে খলিফা হিসেবে তাঁর শপথ গ্রহণ। 'কুস্‌তান্তিনিয়া'র (ইস্তাম্বুল) থেকেও বাগদাদকে সুন্দর রূপে গড়ার প্রত্যাশা তাঁর। এজিদের বয়স তখন ১৬। রসুল-দৌহিত্র ইমাম হাসানকে বিষপান করার ঘটনা এখানেও ব্যক্ত। তবে জায়েদা সরাসরি নয়, একজন চাকর সহযোগে জায়েদা ও মায়মুনা মধুর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে। পরে ওষুধের নাম করে খাওয়ানো হয় হীরকচূর্ণ। এ-উপন্যাসেও হাসানের তিন স্ত্রী হাসনা বানু, জায়েদা ও জয়নাব। তবে ইতিহাস বলে, তিনি ছিলেন একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী। জায়েদা নামে (বা ভিন্ন নামেও) তার কোনো স্ত্রী থাকতে পারে। তাঁকে 'মিতলাক'ও বলা হয়েছে। মিতলাক অর্থ বৃহৎ-স্ত্রী পরিত্যাগকারী। (*এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*-২ : ২৭৪)। হাসানের মৃত্যুর কিছুদিন পর মাবিয়া সৈন্য পাঠিয়ে ইফরিকিয়া (আফ্রিকা) ও আর্মেনিয়া জয় করেছেন। এবার তিনি 'আল কুস্‌তইন্তনিয়া' জয় করতে চান। মাবিয়া তার পুত্রকে আহ্বান করেন "...হে পুত্র এজি! তুমি নিশ্চয় জানো মহানবি হযরত মহম্মদ কী ফরমায়েস করে গিয়েছেন! আমার উম্মতের মধ্যে যারা সিজারের শহর আক্রমণ করবে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ২৯)। ইতিহাসের এজিদপন্থিরা কিন্তু এ-যুদ্ধকে ইসলামী রাজ্যসম্প্রসারণের নজির হিসেবে দেখতে আগ্রহী। ফলে তারা মনে করেন–কারবালার যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনা মর্মপীড়াদায়ক হলেও, এজিদকে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯)।

বিষাদ-সিন্ধু অপেক্ষা *বিষাদবিন্দু*তে ইতিহাসের উপকরণ অধিকতর। সে-ইতিহাসের সঙ্গে লেখকের অনিন্দ্যসুন্দর কল্পনা অবিমিশ্র। খলিফা ওমরের ইয়ারমুকের যুদ্ধে জয় লাভ, এছাড়া কাদাসিয়ার যুদ্ধে ইরাক বিজয়, সিরিয়া প্যালেস্টাইন লেবানন মিশর অধিকার ইত্যকার নানা তথ্যে সমৃদ্ধ *বিষাদবিন্দু*। মাবিয়ার কাবুল জয়ও উল্লেখযোগ্য। ঐতিহ্যমুগ্ধ মাবিয়ার প্রত্যাশা এজিদ সৈনাপত্য গ্রহণ করে অগ্রসর হোক কুসতান্তিনিয়া তথা ইস্তাম্বুল জয়ের জন্য। (দ্র. *বিষাদবিন্দু*, পৃ. ২৯)। এই কুস্‌তান্তিনিয়া জয়ের পথেই ঘটে এজিদ-জাবালা প্রণয়। রাত্রির অন্ধকারে আনাতোলিয়ার রাজকুমারী জাবালার আগমন ঘটে এজিদের তাবুতে। তার পর্দা উৎসারিত পূর্ণশশী মুখ-দর্শনে

এজিদ রূপমুগ্ধ। সুরার থেকেও নারী-সৌন্দর্য তাকে উন্মত্ত করে তোলে। অগ্নি উপাসক জাবালা এজিদের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে সম্মত কিন্তু ধর্মচ্যুতিতে অসম্মত। তাই সে 'আহলুল' মতে বিবাহের কথা বলে। বিন জাবালার রূপে বিমোহিত এজিদ বিনিদ্র রজনী অতিক্রম করে। পাত্রের পর পাত্র সুরার সঙ্গে কবিতা আওড়ে যায় সে। এজিদ সম্পর্কে বিন জাবালা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে। সে জানত, পাশা-শিকার-সুরায় মত্ত এজিদ মূর্খ। কিন্তু এমন কবিতা আর গান যার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত– সে তো অসাধারণ! এজিদ তরবারি রেখে রেবাব(বেহালা) হাতে তুলে নেয়। ইস্তাম্বুল সম্পর্কে বিন জাবালা জিজ্ঞেস করে এজিদকে। সে তার পিতার কণ্ঠশ্রুত হাদিস এড়িয়ে কৌশলগত জবাব দেয়। বাইজান্তিনের সামন্তপ্রভূ মুসলমানদের রাজভৃত্যকে খুন করার জন্যই এখানে মুতাহ-র যুদ্ধ। তাছাড়া কুসতান্তিনিয়ার মতো সৌন্দর্য অধিষ্ঠাত্রী শহর এজিদ হাতছাড়া করতে সম্মত নয়। কেননা এ-শহর সেই শহর যা, ইউরোপ আর এশিয়াকে আলাদা করেছে। কৃষ্ণসাগর আর মারমারা সাগরের মিলনবিন্দুও এই শহর। কৃষ্ণসমুদ্র ও ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য তরীস্পর্শী এ-সমৃদ্ধ শহর এজিদের পরম আকাঙ্ক্ষিত। তাছাড়াও রোমের সম্রাটকে সে পরাস্ত করার সঙ্কল্প করে।

এইসব রাজনৈতিক কাহিনির অভ্যন্তরেই প্রবেশ করে এজিদের অন্তরাত্মার গভীর সংবেদ। বস্তুত রাজনীতি, সমরকৌশল ও ইতিহাস এখানে কাহিনি-বয়নের উপকরণ মাত্র। দক্ষিণ প্রাচ্য থেকে বাবেলের রাণীর চিঠি আসে। উম্মে রামালা নামক অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে এজিদের বিয়ের পয়গাম আসে। রাজনৈতিক কারণে এজিদ এ-বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে সু-সজ্জিত বিন জাবালার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। এজিদ তাকে হৃদয়ে স্থান দেয় কিন্তু পরিণয়ে জড়ায় না। যাকে ভালবাসা যায় তাকে বিয়ে করতে নেই—কবি বন্ধু আখতালের অমৃত বচন স্মরিত হয়। এজিদের অনুচররা বিন জাবালাকে তার রাজপ্রাসাদে রাখতে যায়। নতুন শিবির খোলা হয় আইদিনসিকে, এর আঞ্চলিক নাম 'সাইজিকাস'। এ-শহরটি এজিদ প্রায় বিনা বাধায় অতিক্রম করে। গ্রিক পেলাসজিয়ানদের সৃষ্ট এ-নগরে প্রায়শ ভূমিকম্প হলেও তা সৌন্দর্যময় ও স্বর্ণমুদ্রাখ্যাত। কনস্ট্যান্টিনোপলের এই আইদিনসিক ও তাজমির জয় করে এজিদ। এরপর মূল ফটক গুড়িয়ে দেবার পর সে দামাস্কা পৌঁছায়। এজিদ যখন ফিরে আসে তখন পিতা মাবিয়া অসুস্থ। ব্যাগ্র হয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের জিজ্ঞাসার জবাব তাকে দেয় এজিদ। এসব ঘটনার মধ্যেই এজিদকে পাই রাজনীতি দক্ষ, প্রেমিক ও শিল্পী হিসেবে। মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু*তে এজিদের এসব প্রণয় বিবাহ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ নেই।

এমনকি নিজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ব্যাপারে এজিদের জ্ঞান ছিল প্রখর। ধর্মের বিধিবিধান সে সবসময় মানতো না। কিন্তু সে সম্পর্কে বিদ্যাও তার কম ছিল না। একবার তার প্রিয়বন্ধু কবি আখতাল অনবদ্য ছড়া 'কুয়াফিয়া' পড়ে শোনায়। সেই আসরে জাবাল ইবনে জাওয়ালের কবিতার প্রসঙ্গ ওঠে। এজিদ তাঁর নাম শুনলেও

কবিতা পাঠ করেনি। জাবাল সদ্য ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। আখতাল এজিদকে বলে "এখন তো ইসলাম ধর্মের স্বর্ণযুগ। কেবল তুমিই ধর্মটা মানলে না। এখনও সময় আছে এজিদ, পিতৃপুরুষের ধর্মকে সম্মান করতে শেখো।" (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ৪৩)। এজিদের প্রত্যক্ষণ– সে তাকে ধর্মও মানতে বলে আবার সুরাও পান করতে বলে। আশ্চর্য হয়ে এজিদ আখতালের এই দ্বৈতমনোবৃত্তি জানতে চায়। কিন্তু আখতাল সুরাপান বিষয়ে এজিদের ধর্মজ্ঞানের ব্যাপারে অবাক হয়। মোল্লারা নাকি এজিদকে কোরানশিক্ষা দিতে পারেননি। এজিদ স্বীয় বেদুইন স্বভাবটা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু নিজেকে সংযত করতে অক্ষম এজিদ বারবার সুরার কাছে ফিরে যায়।

উম্মে রামালা ও এজিদের মেয়ের নাম রাখা হয় বিলকিস। উম্মে রামালা জানায়, এ-নামে তার মা ভাইবোন কেউ খুশি নয়। রামালার মা তার নাতনির নাম রাখতে চেয়েছিলেন রাফালা। 'রাফালা' মানে বেহেস্তের হুরি। কিন্তু এজিদ নাম রাখে বিলকিস যার আভিধানিক অর্থ সূর্যের চারপাশে ভ্রমরণরত তারকা। এজিদ তার পোক্ত ইতিহাস-জ্ঞানে অবগত করে যে, এককালের রামালাদের সেবার রাণী ছিল বিলকিস। সহস্র বছর পূর্বের হাবেশ ও জুমহুরিয়ার রানি মালাকাত সেবার প্রসঙ্গ তোলে সে। তারই রাজধানী ছিল এই সেবা যার আরেক নাম 'মারেব'। এ-প্রসঙ্গেই আসে সোলায়মান নবির 'হুদহুদ' পাখি প্রসঙ্গ। সবপ্রাণির ভাষা বুঝতেন নাকি নবি সোলায়মান। সেই পাখি রানি বিলকিসের রাজ্যের খবর নিয়ে যায় বাদশা সোলায়মানের কাছে। মিথ ও ইতিহাস এখানে একীকৃত হয়– এ-কৃতিত্ব এজিদের। মোদ্দা কথা– কন্যার নামকরণ এজিদের ইতিহাস-জ্ঞানেরই একটা অংশ।

এহেন এজিদ ইতিহাসের প্রতিনায়ক। কিন্তু শিল্প-অন্তকরণে আর হার্দিক রক্ষক্ষরণে সে হয়ে ওঠে মানবিক ইতিহাসের অনন্য পুরুষ। *বিষাদবিন্দু* উপন্যাসে এজিদকে অঙ্কন করা হয়েছে কখনো ঐতিহাসিক মানব, কখনো রক্ত মাংসসম্ভূত, হাহাকারের প্রতিভূ। ঠিক যেমন *বিষাদ-সিন্ধু*তেও আমরা লক্ষ করি। কিন্তু *বিষাদবিন্দু*তে অধিকতর ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহৃত, এজিদ চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানে যা খুবই প্রয়োজনীয়। মীর মশাররফ হোসেন যতটা ইতিহাসের কাছে গেছেন তারও অধিক পরিমাণে গেছেন শামিম আহমেদ। বাঙালি মুসলমানের আবেগ নয়, এজিদ সেখানে বিশ্বশ্রুত ইতিহাসের অংশ।

*বিষাদবিন্দু*র এজিদকে মৃত্যুচেতনা সাংঘাতিকভাবে আলোড়িত করে। আরব কবি আল খানসার মৃত্যুর পর তা আরো বৃদ্ধি পায়। এই আল খানসাও ঐতিহাসিক কবি। যার কবিতা স্বয়ং নবি মুহম্মদ(সা.) পছন্দ করতেন। এজিদের কাছে এই খানসার কবিতা এখন নিত্যসঙ্গী। পুত্র শাকরের মৃত্যুতে সে মুহ্যমান প্রায়। মৃত্যু যেন তার দিকে ধেয়ে আসছে গোপন শত্রুর মত। এজিদের জীবনে অকস্মাৎই তা আঘাত হানবে। প্রিয়তম পুত্র শাকরের জন্য খানসার কবিতাটি এজিদ পাঠ করে :

> প্রিয়তম পুত্র শাকর,/ উপত্যকায় সবাই কাঁদে/ এমনকি পাখিও/ তোমার জন্য।/ যোদ্ধারা যখন সাজে/ তাদের তরবারি/ স্বচ্ছ নুনের মতো।/ ধনুকের টঙ্কার আর্তনাদ।/ ভিজে বর্ষা সাহসী/ শিকারী সিংহ যেমন।/ প্রিয়জনকে, পরিবারকে বাঁচালে/ তুমি, যুদ্ধ করে ;/ এমনকি মরুভূমির পথভোলা/ পথিককে। বাতাসের গর্জনে/ সুখী মানুষ, তাদের চোখের নীচে/ মেঘে-মেঘে উড়ছে ধুলো/ প্রিয়তম পুত্র শাকর/ যুদ্ধও শহিদ তোমার/ মৃত্যুতে। (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ৫০)

বাবেল থেকে রাতের অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়তে হয় এজিদকে। কিন্তু সৌন্দর্যনগর কুস্তান্তিনিয়ায় যাবার ইচ্ছে তার নেই, সে দামাস্কায় ফিরে যেতে চায়। রামালা আর কন্যার সঙ্গে এ-জীবনে তার সাক্ষাৎ হবে না। এজিদ তখন সত্যি ভিন্ন মানুষ। সে সুরা ত্যাগ করে, সৎপথে পরিচালিত হতে ঈশ্বরে প্রার্থনা করে। দলবলসহ সে হজ্বব্রতও সম্পন্ন করে দু বার। কিন্তু দামাস্কায় ফিরে এসে এজিদ মহাসমস্যায় পড়ে। কবি আখতালের একটি কবিতা নিয়ে তখন মহা তোলপাড়। মদিনা থেকে আনসাররা মাবিয়াকে তার নামে অভিযোগ করে। কোরেশদের গুণ বর্ণনা করলেও কবিতায় আনসারদের সম্পর্কে অত্যন্ত ঘৃণ্য মন্তব্য করেছে আখতাল। এজিদ বোঝে আখতাল অন্যায় করেছে। মক্কায় মহানবি পীড়িত হলে মদিনায় হিজরতে যান। তখন আনন্দ-বিষাদ, যুদ্ধ ও শান্তিতে এই আনসাররাই ছিল তাঁর অনন্য সঙ্গী। তারা না থাকলে ইতিহাসের গতি ভিন্নতর হতো। মাবিয়া আখতালের শাস্তি দিয়েছেন জিহ্বা কেটে নেয়ার। কিন্তু এজিদ বন্ধুত্বের মূল্য রক্ষা করে আখতালকে সিরিয়া ছেড়ে কাবুলে পালাতে সাহায্য করে। এখানেও এজিদ মানবিকতায় উদ্ভাসিত জীবনের মহানায়ক।

ইতিহাসের আরো অনেক উপকরণ ছড়ান ছিটান রয়েছে *বিষাদবিন্দু*তে। দামাস্কায় ফিরে এসে এজিদ জানতে পারে, বসরা ও কুফার শাসক জিয়াদের মৃত্যুসংবাদ। সে আবদুল্লাহকে বসরার এবং দাহ্হাককে কুফার শাসক নির্বাচিত করে। উবাইদুল্লাহকে খোরাসানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে সেখানে বসায় আবদুর রহমানকে। এজিদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা কুচক্রী মারওয়ানকে মদিনার শাসক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এজিদের চরম উপলব্ধি– পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসা সহজসাধ্য নয়। সে তার রাজনৈতিক বিবেচনায় দুজন শত্রুকে প্রত্যক্ষ করে। একজন বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লা যিনি ছিলেন নবি মুহাম্মদ(সা.)-এর সাহাবি, অন্যজন আলীপুত্র হোসেন। আবদুল্লার মা আসমা বিবি খলিফা আবু বকর (রা.) কন্যা। তার বাবা বিবি আয়েশার তুতো ভাই আল জুবাইর। মদিনায় তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে প্রথম মুসলমান। তিউনিসিয়ার সুলতান গ্রেগরিকে হারিয়ে সফেতুলার যুদ্ধকে তিনি অমর করে রেখেছেন। ইরাক, দক্ষিণ আরব, এমনকি সিরিয়ার একটা বড় অংশ এবং মিশরের মুসলিমরা আবদুল্লাহর সমর্থক। তিনিই হোসেনকে পরামর্শ দিয়েছেন মাবিয়ার ইন্তেকাল হলেই মক্কায় শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।

*বিষাদবিন্দু*তে উমাইয়া খলিফাদের নানা বিজয় অভিযানের প্রসঙ্গ উঠে আসে। মূলত উমাইয়া শাসন ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি স্বর্ণযুগ। এজিদ তার পিতার মৃত্যুর পূর্বেই রাজ্যশাসন, রাজবুদ্ধি, রাজনীতি পরিচালনার উপযুক্ত কূটকৌশল আয়ত্ব করতে চায়। মারওয়ান ছাড়া আরো দুজনকে সে বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে নেয়। তার ধারণা– বিপদে এরাই বড় সহায় হতে পারে। এই দুজন হলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, আল নুমান ইবনে বশির। উবায়দুল্লাহকে এজিদ আমুদরিয়া পার হয়ে বুখারা জয় করতে পাঠায়। এদিকে ইস্তাম্বুলে তার সৈন্যরা বিশেষ সুবিধা করতে ব্যর্থ হয়। হাজার বছরেরও অধিক পুরনো শহর এই বুখারা ছিল পেগান-অধ্যুষিত। বুখারার মাখ্ বাজারে দৈনিক অর্ধলক্ষ দিরহামের মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হয়। অন্যদিকে আল নুমান রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে ইসলাম ধর্মের 'বয়েত' নিয়ে যান।

এজিদ সম্পর্কে সাধারণ বয়ান—সে পাপাচারি, সুরাসক্ত ইত্যাদি। কিন্তু তার ভেতর বয়ে যায় কবিতার নহর। অন্যদিকে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সম্পর্কে তার রয়েছে প্রশংসনীয় ধারণা। এজিদ সম্পর্কে *বিষাদবিন্দু*তে উঠে আসে একজন গভীর শিল্পবোদ্ধা ও দার্শনিক চিন্তাসম্পন্ন মানুষের কথা। সে তার মায়ের কাছেই শোনে আফলাতুন (প্লেটো) ও আরুস্ততালিস (অ্যারিস্টটল)-এর গল্প। সাধু ইস্তেফানের কাছে পুত্র খালিদকে সে শেখায় 'ফালসাফা' বা দর্শন। যুক্তিবাদী গ্রিক দর্শন দ্বারা এজিদ বিশেষভাবে প্রভাবিত। তার পুত্রকে সে শেখায় আরবি সঙ্গীতের সপ্তস্বর– দা-রে-মি-ফা-লা-সা-তি। পুত্র খালিদ জানতে চায় এই সপ্তস্বরের দর্শন। এজিদ তাকে প্রথমে সঙ্গীতের সপ্তসুরের দর্শন বলে। তারপর প্রেমের গান শেখায় পুত্রকে।

> বা-আউল হাগা। আগাবি আলা বিন্‌ত্ হাব্বাইত গাদা উয়ি-আলিত্ লাউ আসিদ্ ...
>
> এ গানের অর্থ : আমি কিছু বলি। একটি মেয়েকে দেখে অবাক হই, সে দারুণ একটা ছেলেকে ভালোবেসেছিল এবং তাকে কবিতা শুনিয়েছিল।

সঙ্গীত দার্শনিকতা ও প্রকৃতি প্রসঙ্গ বারবার ফিরে আসে এজিদ চরিত্রে। সেখানে মিথ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। "ওহে মুসা, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো। হজরত বিস্মিত হয়ে তাই পালন করলে পাথরটি ভেঙে সাত টুকরো হয়ে যায় ; ওই সাতটি খণ্ড থেকে সপ্তস্বর ভেসে আসে।" (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ৫৭)। তবে পারস্যের লোকেদের কাছে রয়েছে ভিন্ন মিথ। তারা বলে, "দুর্লভ একটি পাখি ছিল, যার ঠোঁটে সাতটা ফুটো আর সেই সাতটা ফুটো থেকে সাত স্বর বেরোয়। সেই দিনও নেই পাখিও নেই, কিন্তু সপ্তস্বর আছে।" (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ৫৭)। এই সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আবর্তিত হতে হতেই তীব্র বিষাদ এজিদকে পর্যুদস্ত করে। একহাতে সে তরবারি তুলে নেয় আর অন্য হাতে তুলে নেয় রেবাব। রেবাবে সে বাজায় 'রুকবানি' সুর। সে পুনরায় রাজনৈতিক ভাবনা-মত্ত হয়; আবার যুদ্ধে যেতে চায়। রেবাব সঙ্গীত পোষ্যপ্রাণী ঘোড়দৌড় ফেলে সে যেতে

চায় কুস্তান্তিনিয়ায়। কারণ প্রিয় কুস্তান্তিনিয়ার দায়িত্ব সে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। সে উপলব্ধি করে, বাৎসল্য থাকলে রাজা হওয়া যায় না। পৃথিবী জয়ের নেশায় জেগে ওঠে সে। কোরানের সুরা রুম সে আবৃত্তি করে। কারণ সেখানেই নাকি রয়েছে তার স্বস্তি।

এজিদ তাই ফদালাহ ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের যুদ্ধ পরিচালনার ওপর আর নির্ভর করতে পারে না। কুস্তান্তিনিয়া দখল না হওয়া পর্যন্ত সে দামাস্কায় ফিরবে না। পিতা মাবিয়ার মৃত্যুর আগেই এজিদ কুস্তান্তিনিয়া তথা ইস্তাম্বুলকে অধিকৃত করতে চায়। কিন্তু ফদালাহকে দেয়া দায়িত্ব অবহেলার দরুণ রোমানদেরকে পরাজিত করা সম্ভব হয় না। বিদ্রোহীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে এজিদ তাকে দায়িত্ব থেকেও সরায় না। এখানে এজিদ চরিত্রের দুর্বলতা চিহ্নিত হয়। তবে সেসব দুর্বলতা যেন মহান দুর্বলতা। সে ধর্মীয় বাণীর চেয়েও ফালাসাফা তথা দর্শনকে অধিক গুরুত্ব দেয়। সে তর্ক করে, ধর্মীয় নীতির চেয়ে আরিস্তুতালিস, আফলাতুন নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়– এভাবে যবনদের চিন্তা ইসলামী চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ভয়ানক বিপদ। এদিকে এজিদের শিল্পী মন ধর্মনিষিদ্ধ জীবজন্তুর ছবি আঁকার দিকে মগ্ন। দামাস্কার মসজিদ সে তৈরি করেছে রোমান শিল্পকলার আদলে। সে এখন সুরা ত্যাগ করেছে কিন্তু কবিতা রচনা তার থামেনি, গানবাজনাও চলছে সমান তালে। কখনো সিকাহ্, মুস্তার, আজম, জিহারকাহ সঙ্গীত বাজাতে থাকে এজিদ। 'কুয়াফিয়া' নামক একধরনের কাব্য তার মাথায় ভর করে। প্রাসাদের গায়ে কবিতা লিখে মোল্লাদের অসন্তুষ্ট পর্যন্ত করে সে। সে কবিতা আনাতোলিয়ার রাজকুমারীর প্রতি লেখা।

আনাতোলিয়ার রাজকুমারীর প্রতি

> আগুন দেখেছি দুই চোখের পাতায়/পুড়িয়া খাক করুক মরুর ছায়ায়/তোমার খেলার অগ্নি নিয়ে আমি সুখী/বারবার মনে পড়ে আমি তো একাকী/কাসেদের কাছে ছুটি কেন বার বার/চিঠি অবশেষে এল কি হে তোমার!/ভুল যেন বা গর্ব, না ভেবে পারিনি/তুমি বিস্মিত হয়ো ধর্মচারিণী/ধর্ম ভাঙে সুখে, টুকরো দুখে/সময় ভাঙে আমার দু-মণিবন্ধে/ধর্মে অমর হতে চায় লোভী-দল/ফেলো না চোখের জল। ধর্মের কল/নিশ্বাসের মতো ঝেড়ে ফেলো। ধর্ম-/দাঘ! টেনে নাও জ্ঞান-সুকর্ম।
> (*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ৯৯)

উপন্যাসে উল্লিখিত যে, এজিদ জন্মের সময় মরুভূমির গাধা ও অন্যান্য পশুরা চিৎকার করে উঠেছিল। এজিদ নাকি ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদেনি, খচ্চরের মতো চেঁচিয়েছিল। আর পাখিরা ভয়ে উড়ে গিয়েছিল। বস্তুত এজিদ সম্পর্কে অনেক অতিলৌকিক গল্পই প্রচলিত। কিন্তু এজিদের ভাষ্য, তারা অজ্ঞাত তার অন্তঃকরণ; ফালাসাফা, সঙ্গীত আর কাব্য বিষয়ে সে কত অগ্রসর। তরবারির খেলায় তাকে যে কেউ পরাস্ত করতে অপারগ। কিন্তু কুসতান্তিনিয়ার সৈন্যদল আগামেমননের দেশ থেকে

এনেছে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। এভাবেই গ্রিক সভ্যতা আর ইউনানীর সভ্যতার সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে আধুনিক ইতিহাস বোধের সঙ্গেও সংযোগ ঘটে *বিষাদবিন্দু*র ইতিহাসের।

খ-২.

বস্তুত *বিষাদ-সিন্ধু* ও *বিষাদবিন্দু* দুটো উপন্যাসের মধ্যে এজিদ চরিত্র-অঙ্কনে লেখকদ্বয়ের শিল্পিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যদিও জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নানা প্রসঙ্গে দুটো উপন্যাসে রয়েছে ভিন্নতা। কেননা এজিদের মৃত্যুকে স্বাভাবিক দেখানো হয়েছে *বিষাদবিন্দু*তে, ইতিহাসের সত্যও তা-ই। মর্মান্তিকভাবে স্বীয় অশ্বের পদাঘাতে মারা যায় এজিদ। কিন্তু *বিষাদ-সিন্ধু*তে তার পরিণতি 'এজিদ কাহারো বধ্য নহে'। এজিদের মাতা মাইসুন বিবির প্রসঙ্গ *বিষাদবিন্দু*তে নতুন। এখানে এজিদ-ভগ্নী সালেহা (যার সঙ্গে জয়নাবের পূর্বস্বামী আবদুল জব্বারের কাছে বিয়ের প্রলোভন দেখানো হয়) সম্পর্কে রয়েছে অন্যরকম তথ্য। এজিদ জানত না সালেহা তার বৈমাত্রেয় ভগ্নী। একসময় এজিদ তার প্রতিও মুগ্ধ হয়েছিল। তবে জয়নাব প্রসঙ্গ এ-উপন্যাসে তত উল্লেখযোগ্য নয়। আবদুল্লাহর কন্যা কুলসুম, বিন জাবালা, উম্মে রামালা প্রভৃতি নারী-প্রসঙ্গে এজিদ বহুপ্রজ প্রেমিক। পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত পিতা এজিদও নবভূমিকায় আবর্তিত। মক্কা, মদিনা, আফ্রিকা, সিরিয়া প্রভৃতি শহর ও দেশে এজিদের আধিপত্য বিস্তারের রাজনৈতিক প্রসঙ্গসমূহ স্পষ্ট ও জ্বলজ্বলে। এজিদ চরিত্রের প্রেম-সুরা-সঙ্গীতের প্রভাব ছাড়াও কিশোর সমকামের প্রসঙ্গটিও ব্যতিক্রম। এজিদের ব্যক্তিগত পশুপ্রেম, ঘোড়া-বানর ও চিতা দৌড় এবং দরবার অভ্যন্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ *বিষাদবিন্দু*তে বর্ণিত।

ঐতিহাসিকভাবে আব্দুল্লাহ জেয়াদ নামক কুফার শাসন কর্তার ভূমিকা উভয় উপন্যাসেই গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। *বিষাদ-সিন্ধু*তে কতকগুলো চরিত্র যেমন, ইরাকের মসহাব কাক্কা, গাজী রহমান কিংবা হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হানিফা প্রসঙ্গে অতিরঞ্জন রয়েছে। মসহাব কাক্কা, গাজী রহমান চরিত্র দুটো *বিষাদবিন্দু*তে নেই। তার বদলে রয়েছে মুখতার প্রসঙ্গ, যিনি হোসেন হত্যার প্রতিশোধে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালান। এই মুখতার[৪] একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। হযরত আলী(রা.) বংশের হানিফা

৪. কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর মুখতার হোসেন(রা.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন। এসময় তিনি অনুশোচনাকারীদেরকে উৎসাহ প্রদান করে কবিতা রচনা করেন। এসময় রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে তিনি কারাগারে ছিলেন। কারামুক্তি ঘটলে তিনি মুহম্মদ হানাফিয়া নামক হযরত আলীর এক পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি কারবালার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মফীজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১৮৪

ওরফে হানাফিয়াকে খলিফা বানানোর ঘোষণা তার মুখ থেকেই আসে। ওবায়দুল্লা জেয়াদ যে ছিল কুফার অধিপতি তারই নির্দেশে ইবনে সা'দ ইমাম হোসেনকে হত্যার নির্দেশ দান করে। *বিষাদ-সিন্ধু* উপন্যাসে ওবায়দুল্লা জেয়াদের নাম হয়েছে আব্দুল্লা জেয়াদ। *বিষাদবিন্দু*তে এই ঐতিহাসিক নামটি হচ্ছে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ। বস্তুত এই ব্যক্তিটির প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় কারবালার হত্যাকাণ্ড ঘটায় সৈন্যবাহিনি। তার সেনাপতি উমর বিন সাদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোসেনের প্রতিপক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। হোসেনের কাটা শিরের অবমানননা প্রসঙ্গে জিয়াদের নাম পূর্বোল্লিখিত ইবনে কাসীর লিখিত ইতিহাস স্বীকৃত। *বিষাদ-সিন্ধু*তে উল্লিখিত কাটা শিরের অবমাননা প্রসঙ্গ, এমনকি হোসেন শির অবমাননা প্রসঙ্গে যে-বর্ণনা প্রাপ্ত তাতে ইতিহাসের স্বীকৃতি মেলে স্বল্পই। কারবালা প্রসঙ্গে *History of the Arabs* গ্রন্থে Philip K. Hitti-র বর্ণনায় সত্যের আভাষ মেলে। সেখানে ওমর বিন সা'দ নামক সেনাপতির নির্দেশে হত্যাকৃত ইমাম হোসেনের কাটা শির দামাস্কায় এজিদের কাছে পাঠানো হয়। তারপর ইমাম হোসেনের বোন ও পুত্রের নিকট তা হস্তান্তর করা হয়।[৫]

অন্যদিকে কারবালা যুদ্ধ প্রসঙ্গে *বিষাদবিন্দু*র বর্ণনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইতিহাস-অনুগামী। সেনাপতি উমর বিন সাদ, যোদ্ধা হুর, সিমার ইবনে সিল-জওশান প্রসঙ্গও স্পষ্ট। *বিষাদ-সিন্ধু*র আজর নামক পৌত্তলিকের কথা *বিষাদবিন্দু*তে বর্ণিত হয়নি। এমনকি বর্ণিত হয়নি মুসলিমের পুত্রসন্তান হত্যার কথা। তবে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে একজন খ্রিস্টান পাদ্রীর কথা। কারবালা যুদ্ধে হোসেন বাহিনির (প্রতিপক্ষের দ্বারা) কর্তিত মস্তকসমূহ বর্শার মাথায় গেঁথে শহরে প্রদর্শন করা হয়। হোসেনের শির নিয়ে কোনো অলৌকিক অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ *বিষাদবিন্দু*তে নেই। সেই খণ্ডিত শির নিয়ে লোভী সীমারের ত্রস্তে দৌড়ানোর দৃশ্যটিও নেই। এ-বিষয়ে ইতিহাসেই নানামত প্রচলিত আছে।[৬] (কাসীর ২০০৭ : ৩৮০)। ইমাম হাসান-পুত্র বীর কাশেমের কথা *বিষাদবিন্দু*তে উল্লিখিত তবে সখিনার সঙ্গে বিয়ে প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ

৫. Umar, Son of the distinghuished general Sa`d-abi-waqqas, in command of 4000 troops surrounded al-Husayn with the insignificant band of some two hundrer souls at Karbala, about twenty-five miles north-west of al-kufah, and upon their refusal to surrender cut them down. The grandson of the prophet fell dead with many wounds and his head was sent to Yazid in Damascus. The Head was given back to al-Husayn's sister and son, who had gone with it to Damascus, and was buried with the body in Karbala. (Philip K. Hitti, 1968 : 190)

৬. দ্র. ইব্‌ন কাসীর, 'হযরত ইমাম হোসেন(রা.)-এর শির মুবারক', *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (অনুবাদ. আহমদ আবু মূলহিম ও অন্যান্য), ইসলামের ইতিহাস আদি অন্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৮০

অনুপস্থিত। হোসেনপুত্র জয়নাল আবেদীনের মর্মস্পর্শী ভাষণের উল্লেখ উভয়-উপন্যাসে রয়েছে।

*বিষাদবিন্দু*র শেষাংশে এজিদের আত্মদংশন রয়েছে রসুল-দৌহিত্র হাসান-হত্যা প্রসঙ্গে। এজিদ সুরার নেশায় হ্যালুসিনেশনে ভোগে। অন্যদিকে পাপবোধ-স্খালনের জন্য ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট সিজারের শহর তথা রোম আক্রমণের কথা স্মরণ করে নিজেকে প্রবোধ দেয়। আবার মৃত্যুর হিম শীতলতার মধ্যেও একজন করুণহৃদয় শিল্পী বেদনার রুকবানি সুরে জাগ্রত থাকে। এ-উপন্যাসের বড় শৈল্পিকতা ঐতিহাসিকতার বাইরে কল্পনার বোধকে চরম রূপে তুলে ধরা এবং তার জন্য কাব্যিক আবহ সৃষ্টি। মুত্যুবোধাক্রান্ত এজিদের মর্মপীড়াদায়ী জীবনদশা পাঠককে চিন্তিত করে। কবিতার ভাষায় এজিদের শেষদৃশ্যগুলো অন্যরকম হয়ে ওঠে :

হিমশীতলতা শরীরে নেমেছে ডুবে গেছে শেষ সূর্য
মক্কা নগরী আঁধারে ডুবেছে সমরাঙ্গনে তূর্য
বিবি রামালার কন্য রাফালা চাঁদের আলোয় ভাসছে
শশী ডুবে যেও রাতের অতলে, মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

(*বিষাদবিন্দু*, পৃ. ১১৪)

পরিশেষে, *বিষাদবিন্দু*র পরিসর সংক্ষিপ্ত হলেও তা ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ধারণ করে। মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ-সিন্ধু* অনেকখানিই বাঙালির আবেগ-নির্ভর মানস চেতনাজাত। অনেক কল্পিত ঘটনারই সেখানে সত্যতা নেই। বরং প্রচলিত পুঁথিসাহিত্যের কাহিনি ও লোকমানসের প্রাধান্য সেখানে সূচিত। অন্যদিকে *বিষাদবিন্দু*তে শিল্পনির্মাণ-আকাঙ্ক্ষার সমান্তরালে ইতিহাসের তথ্যসমূহ অবিকৃত রাখার প্রচেষ্টা অভিব্যক্ত। ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহারে উভয় উপন্যাসের রয়েছে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য। এজিদ চরিত্র উভয় উপন্যাসেই আবেগঘন ও ব্যতিক্রম। এজিদ বা ইয়াজিদের চরিত্র কোনো ইতিহাসকার স্পষ্ট বর্ণনা করে যাননি। তার সম্পর্কে কোনো পরিপূর্ণ জীবনীগ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু তার অন্তঃকরণ আবিষ্কারের সীমাহীন প্রচেষ্টা রয়েছে দুজন ঔপন্যাসিকেরই। ইতিহাস ও মানবজীবনের গভীরতম সত্যের দ্যোতনা তাতে উদ্ভাসিত। ফলে ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহারে *বিষাদ-সিন্ধু* ও *বিষাদবিন্দু*তে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অপূর্ব শিল্প নির্মিত হয়েছে। মানবজীবনের অন্তর্গত সত্যতাই তাতে মুখ্য, সংঘাত-রক্তপাত-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় ঐতিহাসিক উপকরণ ব্যবহারের নিয়ামক মাত্র।

তথ্যনির্দেশ

আউয়াল, মোহাম্মদ আবদুল, ২০০০, 'বিষাদ-সিন্ধু', *মীর মশাররফের গদ্য রচনা*, গতিধারা, ঢাকা।

আহমেদ, শামিম, ২০১৩, *বিষাদবিন্দু*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, ১৯৯১, 'বিষাদ-সিন্ধু', *মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদ-সিন্ধু, পূর্বোক্ত।*

কবীর, মফীজুল্লাহ, ১৯৭৪, *ইসলাম ও খিলাফত*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

কামাল, আবু হেনা মোস্তফা, ১৯৯১, 'বিষাদ-সিন্ধু', *মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদ-সিন্ধু* (সম্পা. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

কার, ই এইচ, ২০০৬, *কাকে বলে ইতিহাস* (অনু. স্নেহোৎপল দত্ত, সৌমিত্র পালিত), কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা।

কায়সার, শান্তনু, ২০১৫, *মীর মশাররফ হোসেন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

কাসীর, ইব্‌ন, ২০০৩, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* ইসলামের ইতিহাস আদি অন্ত (অনুঃ আহমদ আবু মূলহিম ও অন্যান্য), খণ্ড-৩, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২০০৪, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, *প্রাগুক্ত।*

২০০৭, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৮ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত।*

চৌধুরী, মুনীর, ১৯৬৫, *মীর মানস*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

১৯৯১, "বিষাদ-সিন্ধু'র পুনর্বিচার', *মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদ-সিন্ধু,* পূর্বোক্ত।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০০০, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', *প্রবন্ধসমগ্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা', *প্রাগুক্ত।*

ত্রিপাঠী, অমলেশ (১৯৮৮), *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

দত্ত, বিজিত কুমার, ১৩৯৩, *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, তৃতীয় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

দাশগুপ্ত, অশীন, ১৯৮৯, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

ফারুকী, শাহ আলম খান, ২০১৭, *খুনে রাঙা কারবালা*, মাকতাবায়ে ইবনে মাসউদ রা., বাংলাবাজার, ঢাকা।

মাসরুর, গরীবুল্লাহ, ২০১৩, *কারবালার ইতিহাস*, আশ্‌রাফিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

শাহনাওয়াজ, এ.কে.এম., ১৯৯৭, *বিশ্বসভ্যতা মধ্যযুগ*, অবসর, ঢাকা।

সরকার, যতীন, ২০০৮, 'পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা' *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

হেল, যোসেফ, ১৯৬৯, *আরব সভ্যতা* (অনুবাদঃ মোজাম্মেল হক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হোসেন, মীর মশাররফ, ২০০৯, *বিষাদ-সিন্ধ* ু (ভূমিকা ও সম্পাদনাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ), অবসর, ঢাকা।

Ali, Amir, 1916, *A Short History of the Saracens*, London.

Hitti, Philip K., 1968, *History of the Arabs*, Ninth edition, ST Martins Press, Newyork.

Houtsma, A. and others (ed.), Encyclopedia of Islam, 3rd Part.

Travelyan, G.M. 1921, in sidgwick Memorial Lecture, *A Guide to the best Historical Novels and Tales*, Jonathan Nield, 5th ed.m Int. 18, Cambridge.

[**Abstract:** There are some historical resources in *Bishad-Shindhu* of Mir Mosharraf Hosen and *Bishad Bindu* of Shamim Ahmed. These two texts have been written in different era. Diverse outlook and craftsmanship are also subsisted in these two texts as different historical approaches have been employed. Charecterization and plot arrangement are also divergent. But the merely agreement of two texts could be stablished as the history of Karbala is identical. And the other great harmony of these two texts is discovery of the charecter's inner mind, especially Ezid. Though recognized as anti-hero Ezid is the central driving force of the both novels. The perspective of this paper (*Bishad-Shindhu* and *Bishad Bindu*: Historical diversity) is to ascertain the play of history, poles apart historical objects and structural diversity amid *Bishad-Shindhu* and *Bishad Bindu*.]